গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

ডিসেম্বর '২৪ - মার্চ '২৫ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- এপিডিআর-এর প্রেস বিবৃতি / পৃ. ২
- গ্যাস চেম্বারে পরিণত দিল্লী / পৃ. ৩
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৯ম কিস্তি) / পৃ. ৬
- দিশাহীন বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন / পৃ. ৭
- এন আই এ-এর অনৈতিক অভিযান / পৃ.১০
- ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ / পৃ. ১১
- প্রতিবেদন / পৃ. ১৩
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৪-২৫ এবং ৩২
- রিপোর্ট / পৃ. ২৫-৩২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

শিরে হল সর্পাঘাত

গত কয়েক বছর ধরেই এপিডিআর বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তুলে আসছিল। দিল্লি হাইকোর্টের এক বিচারপতির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণ করে দিল। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের অনাস্থা চরমে। যেটুকু মোহ ছিল বিচার ব্যবস্থার প্রতি সেটুকুও বিরাট ভাবে ধাক্কা খেল এই ঘটনায়। প্রশ্ন উঠে গেল, শিরে হল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথায়? বিখ্যাত আইনজীবী প্রশান্তভূষণ এবং প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণ একসময় প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন, দেশের প্রথম ১৬ জন প্রধান বিচারপতির মধ্যে অন্তত আট জন দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রশান্তভূষণদের বিরুদ্ধে সেই সময় আদালত অবমাননার মামলাও হয়েছিল। ব্যাপক হৈ-চৈ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকচক্ষুর আড়ালে সব ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ১৫০০ অভিযোগ এসেছে। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার খবর সরকারের কাছে নেই। বস্তুত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া খুব কঠিন। তাঁরা নিজেরা পদত্যাগ করে সরে না গেলে অপসারণ কার্য্যত অসম্ভব। সরাতে হয় ইমপিচমেন্ট-এর মাধ্যমে। আজ পর্যন্ত একটিও ইমপিচমেন্ট ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে হয়নি। বিচারপতি সৌমিত্র সেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করে চলে যান।

প্রশ্নটি একজন নির্দিষ্ট বিচারপতির বিরুদ্ধে শাস্তির নয়; প্রশ্নটি আসলে গোটা বিচার ব্যবস্থা নিয়েই। বিচারপতি নিয়োগ থেকে কর্ম্মরত বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা, এমনকী অবসর পরবর্তী জীবন নিয়েও। সবটা নিয়েই। দরকার আমূল সংস্কার। বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগে কলেজিয়াম ব্যবস্থা বাতিল করে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে নিতে চাইছে। অন্তত সরকার একটা প্রধান ভূমিকায় থাকুক এটাই চাইছে বিজেপি ও কেন্দ্রীয়

সরকার। এজন্য তারা একসময় আইন পাশ করিয়েছিল। কিন্তু সেই আইন সুপ্রিম কোর্ট আগেই অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। এখন আবার এরকম কোনও আইন আনার কথা ভাবছে তারা।

কলেজিয়াম ব্যবস্থায় বিচারপতিরাই বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা। দেখা গেছে, দেশে অল্প কয়েকটি উচ্চবর্ণের পরিবারের মধ্যেই হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি পদ সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিই এই উচ্চবর্ণের হিন্দু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীকে কেউ ভাঙতে পারেনি। এজন্যই অনেকে মনে করেন, কলেজিয়াম ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। কিন্তু কলেজিয়ামের বিকল্প কী সেটাও স্পষ্ট করে কেউ রাখতে পারেনি। বারবার দায়বদ্ধতার কথা উঠলেও কীভাবে সেটা কার্যকরী করা সম্ভব তাও কেউ দেখাতে পারেনি। বিচারপতিদের রাজনৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতি বারবার সামনে এলেও সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান ঘটনাটিকে দেখতে হবে। এখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের যুগ। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ বিচারব্যবস্থা তথা আইন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সোচ্চার হয়েছেন ফেসবুক বা এক্সে। কিন্তু সব বিরোধিতাই ভার্চুয়াল ক্ষেত্রে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ খুবই স্বল্প। অভিজ্ঞতা বলে, রাস্তায় না-নামলে কিছুই হবে না; হয় না। সুপ্রিম কোর্ট থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পর্যন্ত, বিচারপতি থেকে কোর্টক্লার্ক পর্যন্ত সীমাহীন দুর্নীতি। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা বিচারব্যবস্থা। লক্ষ লক্ষ মামলা বিচারের জন্য বছরের পর বছর ঝুলে আছে। কোন্ মামলা কীভাবে লিস্টে আসছে, কীভাবে আগে পিছে হচ্ছে সে-এক চরম রহস্য। অজস্র পরস্পর বিরোধী রায় নিয়ে প্রশ্নের-তো শেষ নেই। উত্তর দেওয়ার দায় নেই কারও। আশু সমাধানের কোনও সম্ভাবনাও নেই। একটা উথাল-পাথাল নাগরিক আন্দোলন ছাড়া কিছু হবেও না। আশার কথা বিচারপতির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার ব্যাপক মানুষের কাছে ব্যবস্থাটিকে উলঙ্গ করে দিয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষ মেলাতে পারছে দৃশ্যটা। বাকিটা আগামী দিনের কাজ। কারা সে দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু করতে হবে। স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থা এবং ন্যায় বিচার নাগরিকের অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সবারই দায়িত্ব। নীরব থাকলে চলবে না।

প্রতিবেদন

উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম বৃহত্তম ক্রীড়াঙ্গন সোদপুর অমরাবতী খেলার মাঠকে বাঁচাতে এপিডিআর-এর উদ্যোগ

তুফান চক্রবর্ত্তী

সোদপুর স্টেশন থেকে প্রায় ৫০০ মিটার অর্থাৎ ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ৮৫ বিঘা জমি নিয়ে রয়েছে অমরাবতীর খেলার মাঠ। দশকের পর দশক ধরে পানিহাটি অঞ্চলের মানুষের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চর্চার প্রাণকেন্দ্র এই খেলার মাঠ। সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোডের বাঁ'দিকে এই বিস্তৃত প্রান্তরের ভিতরে রয়েছে প্রায় ১৩-১৪ বিঘার জলাশয় ও জলাভূমি (ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নথি অনুসারে জমির চরিত্র বর্ণিত)। দৃশ্যত এই জলাভূমি আয়তনে আরও বেশী। গত শতাব্দীর নয়ের দশক পর্য্যন্ত (১৯৯০ সাল) এই খেলার মাঠের একধারে ছেলেদের একটি অনাথ আশ্রম ছিল। তারপরে ওই আশ্রমটির অস্তিত্ব আর ওখানে ছিল না।

জ্যোতি বসু, মমতা ব্যানার্জি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই মাঠে বিশাল-বিশাল জনসভা করেছেন। পানিহাটি বইমেলা, পানিহাটি উৎসব, জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক উৎসব, মেলা, সর্বজনীন পূজা সহ বিভিন্ন বড় মাপের অনুষ্ঠান এই খেলার মাঠে সাড়ম্বরে সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়। পানিহাটির মানুষের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা এবং উদ্দীপনা এইসব সভা সমিতি, উৎসব, মেলা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দৃশ্যতই থাকে। খুশির জোয়ার বয়ে যায়। সংলগ্ন জলাশয় ও জলাভূমিতে থাকা জীববৈচিত্র্য পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে। এক কথায় এই মাঠ পানিহাটির মানুষের প্রাণের প্রাঙ্গন। ১৭-১০-১৯৯৩ তারিখে বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী (১৭.১০.১৯৯৩ The Statesman) এই মাঠের ফাঁকা জমি কোনও প্রভাবশালী রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী কিনতে চায়। এবং এই ৮৫ বিঘা জমির মালিক (Society for the Protection of Children in India- SPCI) সেই ব্যবসায়ীকে সমস্ত ধরণের কাগজপত্র প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্ত্রীসভার স্তরে তাদের ঘনিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় সমস্যা মিটিয়ে দেবে।

SPIC ৩০০ কাঠা তাদের কাছে রেখে বাকিটা ওই

শেষ অংশ ২৭ পাতা

ঘাতক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর-এক বলি, প্রতিবাদী কণ্ঠ অধ্যাপক গোকরকোন্ডা নাগা সাইবাবা

অজেয় পাঠক

"Why do you fear my way so much?", কবীরের এই ভাষাতেই এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের কর্ম্মী অধ্যাপক-লেখক, গোকরকোন্ডা নাগা সাইবাবা, যিনি শহীদ হলেন গত ১২ অক্টোবর। গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্র তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহস পায়নি। না, তাঁকে ফাদার স্ট্যান স্বামী'র মতো রাষ্ট্রীয় হেফাজতে হত্যা করা হয়নি, তবে তাঁকে প্রায় ৯ বছর হেফাজতে ফেলে রেখে তাঁর অকালমৃত্যুকে নিশ্চিত করেছিল ভারতরাষ্ট্র। এবং গত ১২ অক্টোবর রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। আসলে এই রাষ্ট্র নিজেকে 'গণতান্ত্রিক' নামক স্বঘোষিত বিশেষণে ভূষিত করলেও সে তার প্রতিটি পদক্ষেপেই অঘোষিত স্বৈরতান্ত্রিক।

ইরানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দারিয়ুস রেজালি তাঁর Torture and Democracy বইতে দেখিয়েছেন, কী-ভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শারীরিক অত্যাচার, প্রহার ও নির্যাতনের দাগ গোপন করে রাখার কৌশল বার করে যাতে চূড়ান্ত স্বৈরাচারী হলেও নিজেকে 'গণতান্ত্রিক' হিসেবে তুলে ধরা যায়। তিনি লিখেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সাথে সাথে গণতন্ত্র শুধু নির্যাতনই করে না, নির্যাতনের জন্য আন্তর্জাতিক মানও নির্ধারণ করে দেয়! হিটলার-মুসোলিনি-তোজো-র মতো ঘোষিত স্বৈরশাসকরা হয়তো আরও বেশি নির্যাতন করেছে, এবং আরও নির্বিচারে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের এমন কৌশলগুলির পথপ্রদর্শক এবং রপ্তানিকারক যা আধুনিক বিশ্বে প্রতিবাদী নাগরিকদের উপর নির্যাতনের ভাষা হয়ে উঠেছে; এমন পদ্ধতি যা কোনও চিহ্ন রাখে না। সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্ম্মীদের সজাগ দৃষ্টির সামনে গণতান্ত্রিক নামধারী বিশ্বের কিছু শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রশাসকরা প্রথম বুঝেছিলেন যে, একজন প্রতিবাদী নাগরিককে প্রকাশ্য নির্যাতন করা মানে বিশ্বের কাছে অন্যায়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তার ফলে নিন্দা আর কেলেঙ্কারিকে আমন্ত্রণ জানানো। তাই তারা নির্যাতনকে গোপন করতে তালিম নিয়েছিলেন। আমাদের ভারতরাষ্ট্র এই তালিম খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছে, তা' তারা ধর্মনিরপেক্ষ বা হিন্দুত্ববাদী, যে মতাদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হোক-না-কেন!

ডক্টর সাইবাবাকে রাষ্ট্র বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি, কারণ তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, তিনি ক্ষুরধার-তীক্ষ্ণ মন দিয়ে নির্ভীকভাবে চিন্তা করতে পারতেন, শান্ত থাকতে পারতেন, লিখিতভাবে তার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারতেন এবং নিরাপরাধ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ঘোষিত ভারতরাষ্ট্রের লাগাতার যুদ্ধের বিষয়ে স্বাধীন মতামত রাখতে পারতেন। ২০০৭ সালে ডাক্তার বিনায়ক সেন থেকে শুরু করে, ২০১৪-এ সাইবাবা, ২০১৮ তে ভীমা কোরেগাঁও মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া লেখক-বুদ্ধিজীবী-সমাজকর্ম্মী, দিল্লিতে ২০১৯-২০ সালে সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলন এবং ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশায় অগণিত আন্দোলনকর্ম্মী, সকলেই এদেশে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকার হয়ে চলেছেন।

২০০৫ সালে বস্তারে রাষ্ট্রীয় নাৎসীবাহিনী সালওয়া জুডুমের মাধ্যমে ভারতরাষ্ট্রের দ্বারা জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছিল, যা' ছত্তিসগড়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং এবং বিরোধী দলের কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্র কর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, যার পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। একে অনুসরণ করেই প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ পি চিদাম্বরমের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে কুখ্যাত অপারেশন গ্রিন হান্ট শুরু করা হয়েছিল। সাইবাবার মত সমাজকর্ম্মীরা এই রাষ্ট্রীয় গণহত্যার ষড়যন্ত্রটি উন্মোচন করে দেখিয়েছিলেন, রাষ্ট্র আসলে সবুজের অভিযান বা গ্রিন হান্টের নামে সেইসব সাধারণ আদিবাসীদের হত্যা করছিল যারা শুধুমাত্র তাদের জল-জমি-জঙ্গল রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। এবং উন্নয়নের নামে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ বা বাস্তুচ্যুতিকে চ্যালেঞ্জ করছিল। এই সময়ই সাইবাবা রাষ্ট্রীয় নজরদারির আওতায় আসেন। কারণ, তিনি অন্যদের সাথে এই বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিজের কর্ম্মস্থল দিল্লিতে বিক্ষোভ ও জনসভা সংগঠিত করতে সাহায্য করছিলেন। যদিও, ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে সাইবাবা একা ছিলেন না, তবে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হওয়ায় ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করছিলেন, তাই তাঁকে চাঁদমারি করা হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের চেয়েও রাষ্ট্র ভয় পায় রাজনৈতিক সচেতনতাকে, সাইবাবার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র সেই ভয় পেয়েছিল। তাই ডঃ সাইবাবাকে ২০১৪ সালের একটি মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। সেই মামলা তাঁর বিরুদ্ধে মাওবাদীদের সাথে যোগসূত্র থাকার এবং দুই সহকর্মীকে মাওবাদী নেতৃত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। যদিও মূল

এফ আই আর-এ তাঁর নাম ছিল না, পরে তার নাম যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে বন্দি রেখে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র দশ বছর আগে সেই ২০১৪ সালেই শুরু হয়েছিল, যখন হিন্দুত্ব-ফ্যাসিস্ত বিজেপি নয়, আজকের বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষদের পরম মিত্র কংগ্রেস দল সরকারে ছিল। ২০১৩ সালে বে-আইনিভাবে সাইবাবার বাড়িতে অনুসন্ধানের নামে অভিযান চালিয়ে তাঁর কম্পিউটারসহ তাঁর একাডেমিক কাজের বেশীর ভাগই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁর দক্ষিণ দিল্লীর রামলাল কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে তাঁকে বিনা প্রমাণে গ্রেপ্তার করে তুলে নিয়ে যায়, ইউপিএ সরকার তখনও ক্ষমতায়।

মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং বিচার বিভাগের একটি অংশ নব্বই শতাংশ শারীরিকভাবে অক্ষম ডাঃ সাইবাবার সমস্ত মানবাধিকারকে নাকচ করে তাঁকে নাগপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারের আন্ডা সেলে বা বিচ্ছিন্ন কালকুঠরিতে ফেলে দেয়। এই কালকুঠুরি যে কোনও বন্দীর বা নাগরিকের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ বন্দীদশা। বন্দী হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল করেছিল রাষ্ট্র। নব্বই শতাংশ প্রতিবন্ধীর জন্য কমোড নেই, বিছানা নেই, এমন-কী গুরুতর অসুস্থ হলে ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এমন-কী চিকিৎসার প্রয়োজনে জামিনও নেই। ২০১৬ সালে তাঁকে চিকিৎসা-জামিন মঞ্জুর করা হলেও, তিনি এবং তাঁর সহ-অভিযুক্তদের আবার ২০১৭ সালে কঠোরভাবে মানবতাবিরোধী UAPA আইনের অধীনে দায়রা আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। সাইবাবাকে আবার নাগপুর জেলে আটক করে রাখা হয়, এরপরই তাঁকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তখন শাসনক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদী-স্বৈরাচারী শাসকদল। ফলে, সাইবাবার উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছনোটাই স্বাভাবিক। কারাবন্দী থাকাকালীন সাইবাবার মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে শেষবারের মত দেখবার আবেদন জানিয়েও তিনি সে সুযোগ পাননি, এমন-কী মায়ের মৃত্যুর পর শেষকৃত্য করার জন্যও মুক্তি দেওয়া হয়নি!

২০১৪ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে দশ বছরের মধ্যে সাইবাবা UAPA আইনের অধীনে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে নির্মিত একটি মিথ্যা মামলায় আট বছরের বেশি সময় জেলে কাটিয়েছেন। তিনি, এবং ২০১৭ সালে একই মামলায় দোষী সাব্যস্ত অন্য পাঁচজনকে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে মুক্তি দেওয়ার আগে দু'বার বেকসুর খালাস করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিল। বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে ২০২২ সালের অক্টোবরে তাঁদের প্রথমবার খালাস হওয়ার পরে, মহারাষ্ট্র সরকার তাঁদের আটক রাখতে সুপ্রিম কোর্টকে আবেদন করেছিল। সরকারের আপিল পেয়ে এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অভূতপূর্ব তৎপরতার সাথে মামলাটি হাইকোর্টে পুনরায় পাঠায়, স্পষ্টতই যেন-তেন প্রকারে সাইবাবাকে কারাগারের অন্ধকূপে ফেলে রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। ২ বছর পর ২০২৪ সালের ৭ মার্চ, বম্বে হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত ফৌজদারি অভিযোগ মিথ্যা বলে সাইবাবাকে মুক্তি দেয়। এই অতিরিক্ত দু'বছর সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হলেও মুক্তি না-পাওয়া কারণে অসুস্থ সাইবাবার জরুরী চিকিৎসা আরও বিলম্বিত হয়, যা' তাঁর অকালমৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই দু'বছর সময়ের মধ্যে বারবার তাঁর জরুরী চিকিৎসার জন্য জামিন এবং গৃহবন্দী করার জন্য আবেদন বারবার প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছে যে, প্রতিবাদী সাইবাবাকে হত্যা করার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিচারব্যবস্থাও কী-ভাবে তাদের 'রাষ্ট্রীয়' দায়িত্ব পালন করেছে! নব্বই শতাংশ দৈহিক-প্রতিবন্ধকতা সহ প্যারাপ্লেজিক সাইবাবাকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুবিধা না-দিয়ে ও বিনা চিকিৎসায় 'আন্ডা' সেলে ফেলে রাখা কারা কর্তৃপক্ষের তথা এই রাষ্ট্রের অপরাধমূলক নির্ম্মমতা ও খুনি মানসিকতাকেই প্রমাণ করে। বন্দী অবস্থায় আংশিক পক্ষাঘাত এবং একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। তিনি এবং তাঁর পরিবার তীব্র যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ শারীরিক অবস্থার প্রতি একাধিকবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। মুক্তির সময় সাইবাবা সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অকেজো হয়ে গিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ১২ অক্টোবর, ২০২৪-এ হায়দ্রাবাদের এনআইএম হাসপাতালে পিত্তথলির অস্ত্রোপচারের পর একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি মারা যান।

পুরো বিচার ব্যবস্থা, এদেশের কারাগারগুলির অমানবিক ও মধ্যযুগীয় পরিকাঠামো, পক্ষপাতদুষ্ট তদন্তকারী সংস্থা এবং স্বেচ্ছাচারী আদালতের রায়— সাইবাবার মৃত্যুকে সম্মিলিত -ভাবে নিশ্চিত করেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, তাঁর সহযোগী আর-এক অভিযুক্ত পান্ডু নারোতে ২০২২ সালে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন সোয়াইন ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেছিল। ২০২২ সালের অক্টোবরে এই মামলায়

প্রথম খালাস ঘোষণার ঠিক আগে নরোতের মৃত্যু ঘটেছিল। একইভাবে, ২০২১ সালের জুলাই মাসে, আর-এক শহীদ প্রতিবাদী সমাজকর্মী ফাদার স্ট্যান স্বামীকে খাদ্য, চিকিৎসা ও বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণ না-দিয়ে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ফেলে রেখে হত্যা করে ভারতরাষ্ট্রের প্রভুরা।

সাইবাবার কণ্ঠ আর কলমকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে আন্ডারট্রায়াল হিসাবে, তাঁকে বারবার জামিন দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল, কারণ তিনিও ঘোষণা করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আর শোষণের বিরুদ্ধে তিনি 'নীরব দর্শক' হবেন না ("I am not a silent spectator")। ফাদার স্ট্যান স্বামী, পান্ডু নরোটে এবং সাইবাবার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার জন্য জেল সহ পুরো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে তথা সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই দায়ী করা যায়।

এই রাষ্ট্র যতই মানবাধিকার লঙ্ঘন আর প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা করুক, নিজের 'গণতান্ত্রিক' তকমাটি ঠিক ধরে রাখতে পেরেছে তার চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ তার প্রচারযন্ত্র কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমগুলির সাহায্যে। গত ১২ অক্টোবর, ২০২৪ জি এন সাইবাবার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার খবর প্রায় কোনও সর্বভারতীয় বা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে স্থান পায়নি। যেদিন রাষ্ট্রীয় নৃশংসতার চিহ্ন-সম্বলিত সাইবাবার নিথর দেহ নিয়ে তাঁর স্ত্রী-কন্যা-বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, এদেশের গণমাধ্যম জুড়ে তখন ৯ অক্টোবর প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটা'র জন্য অশ্রু ঝরছে। সাইবাবার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার খবর রাষ্ট্র সফলভাবে আড়াল করতে পেরেছিল, তবে নিপীড়িত মানুষের হয়ে সাইবাবার লড়াই এবং আর প্রতিবাদী কণ্ঠের অভিঘাতকে দমন করতে পারেনি, পারবে না। গত শতাব্দীতে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তির হাতে নিহত বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদাকে উদ্ধৃত করে জি এন সাইবাবা তাঁর "Ode to Life" কবিতায় লিখেছিলেন "I have a pact of love with beauty./I have a pact of blood with people". এদেশের নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে যাঁর রক্তের সম্পর্ক সেই আজীবন সংগ্রামীকে আমরা কী-ভাবে ভুলে যাব!

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার উমর খালিদ

সন্দীপ সিনহা রায়

১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে মে ফরাসি বিপ্লবের মহানায়ক রোবসপীয়ার বলেছিলেন, ''জনতা যখন দেখে তাদের পাশে কেউ নেই, তারা নিজেরাই সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে''।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এমনই এক বিষয়গত অবস্থানে আছে যেখানে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসি অপশাসন ও সরকারি অধঃপতিত বামেদের এবং আঞ্চলিক দলগুলোর নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ভাবে কোটি কোটি জনতাকে শুধু আর্থিক প্রবঞ্চনা নয়, ভারতীয় শাসক শ্রেণীর তল্পিবাহক হয়ে নির্যাতন, নিপীড়ন, বন্দী করা ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলের অন্ধকার কুঠরিতে আটকে রাখা সহ শিল্পপতি, কর্পোরেটদের উদগ্র মুনাফার স্বার্থে অবাধ শ্রম শোষণ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ছোটানো তথাকথিত হিন্দুহৃদয় সম্রাট নরেন্দ্র মোদীর আমলে তা চূড়ান্ত অধোগতিতে পৌঁছেছে যেখানে মানুষ দিকে দিকে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন ও রোষে ফেটে পড়ছেন। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে ''আব কি বার চারশো পার''-এর সুখের খোয়াব দুঃস্বপ্নে শেষ হয়েছে।

একটি ল্যাটিন প্রবাদ ঠিক এইরকম ''ঈশ্বর যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে দিয়ে আগে বাজে কাজগুলো করিয়ে নেন''। মোদী সরকারের এনআইএ, ইডি, সিবিআই এবং দিল্লিতে একটি জনতার রায়ে নির্বাচিত সরকার থাকা সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অধীন। এই সরকারি এজেন্সিগুলি এ-দেশের বিবেক, অনুভবী প্রতিবাদে মুখর যুবশক্তিকে রাষ্ট্রীয় কারাগারের নিকষ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে তিলে তিলে টিপে মারতে চাইছে। প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা করতে চাইছে। যেমন প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা করেছে ফাদার স্ট্যান স্বামীকে। একই প্রক্রিয়ায় সম্ভবত জি এন সাইবাবার দীর্ঘ কারাবাসজনিত কারণে মৃত্যু আসন্ন জেনেই হয়তো তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সাইবাবা জেলের বাইরে এসে মারা গেলেন, কিন্তু রাষ্ট্রের নির্ম্মমতার দলিলে কোনও আঁচড় পড়লো না।

এমনই একজন উদার হৃদয়ের ভালোবাসার পুষ্প ছড়ানো ''ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রচার'' সংগঠনের আহ্বায়ক, ইতিহাস জ্ঞানে ঋদ্ধ তথা দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আন্দোলনের সংগঠন করার কারিগর ছিলেন উমর

খালিদ। তিন বছর ১১ মাস, বিনা বিচারে জেল বন্দী হয়ে আছেন। উমর খালিদের কী সাংঘাতিক অপরাধ ছিল! না, নিশ্চয়ই ছিলেন না। তিনি সিএএ আইনের বিরোধিতা করে দেশের মানুষের কাছে এই সর্বনাশা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন।

তাঁর যে-বক্তৃতায় দিল্লী পুলিশ ''আকাশের গায়ে টক টক গন্ধ'' খুঁজে পেয়েছিল সেই ভাষণটি এই রকম,

"We will not answer violence, anger with anger, if they spread hatred, we will reply with love, if they use batons we will aloft the Constitution, if they put us Jail, we will sing SARE JAHAN SE ACCCHAA HINDUSTHAN HAMARA and gladly head to prison, but we will not let you destroy this Country." কোনও সন্দেহ নেই উমর খালিদের বাগ্মীতা ও প্রকৃত দেশপ্রেম বর্তমান শাসকদের জমানা এবং গোদি মিডিয়াকে ভীত করে তুলেছে। ভীমা কোরেগাও ভুয়ো মামলায় আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমি রক্ষায় দৃঢ়ব্রতী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ও আত্মত্যাগী যোদ্ধাদের মতোই উমর খালিদ জেলের অন্ধকারে পচতে থাকবেন আর জেলের বাইরে নির্ভয়ে বিচরণ করবে মিলিন্দ একবোটে ও শম্ভাজী ভিঁড়ে। সম্ভাজী ভিঁড়েকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'গুরুজি' বলে সম্বোধন করেন।

বিনা বিচারে বছরের পর বছর এই কয়েদি ব্যবস্থাকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভর্ৎসনা করেছেন এবং দিল্লি পুলিশকে সাজানো সাক্ষী পেশ করতে নিষেধ ও সাবধান করেছেন শেষবারের মতো। ২০২২ সালে দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদীদের দাঙ্গায় ৭০০ জন আহত ও ৫৩ জন সংখ্যালঘু নিহত হয়েছিলেন। এমন-কী দিল্লিতে নির্বাচিত আপ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যিনি মূলত যমুনা নদীর পশ্চিম তীরের সংখ্যালঘুদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, তিনিও এই দাঙ্গাকালীন সময় ছিলেন নিশ্চুপ। কিন্তু তাঁর দিকেও কেউ আঙুল তোলেনি। অথচ দিল্লির ওই দাঙ্গায় উমর খালিদের কোনও সংযোগ ছিল না। তাই প্রশ্নই ওঠে না' 'দুষ্কৃতির ভূমিকা'র বা 'ষড়যন্ত্রীর ভূমিকা'র। তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপি আইনের কিছু ধারা অস্ত্র আইন ও জনগণের সম্পত্তি বিনষ্ট করার ভুয়ো অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এইসব অভিযোগের কোনও প্রমাণই দিল্লি পুলিশ পেশ করতে পারেনি। কেবল আদালতে এভিডেন্স পেশ করার জন্য দীর্ঘসূত্রিতার রেকর্ড তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে লম্বা সময়ের আবেদন করে যাচ্ছে। যে-এভিডেন্স বা নথি না-কী খবরে প্রকাশ সংখ্যায় ১১ লক্ষ!

তথাকথিত এই বিচারাধীন প্রকৃতপক্ষে ঘৃণ্য পন্থায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত জেলবন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে বিবেকবান মরমী আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানিয়েছেন, "The Rejection of Umar Khalid's bail by the Delhi High court is unjust.There is absolutly no Credible Evidence against Umar regarding his involvement with any Conspiracy or Violent activity. On the contrary, Videos of all his speeches show him preaching non violence even in responce to violence." উমর খালিদের আইনজীবী ত্রিদিব পাই প্রমাণ করে দিয়েছেন অভিযোগ সমূহের অসারতা এবং ভিত্তিহীনতা। দিল্লি পুলিশ আনীত কোনও সাক্ষী-ই আদালতে দিল্লির দাঙ্গায় খালিদের যোগাযোগের কথা জানাননি বা খালিদ দাঙ্গার কাছাকাছি ছিলেন বলেননি। পুলিশ যে ১৭ টি অভিযোগে খালিদকে অভিযুক্ত করেছে তার মধ্যে কেবল একটি সিএএ বিরোধী অবস্থান যা' তার কোনো অপরাধ নয়ই বরং মানবিক মহত্ত্বে মহীয়ান।

দেশ জুড়ে বহু বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ ভারতের অনেক প্রাক্তন বিচারপতি সিটিজেনশিপ এ্যামেনডমেনট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন। যে ছিটে-ফোঁটা গণতন্ত্র এখনও বজায় আছে তাকে মরিয়া হয়ে রক্ষা করার জন্য।

আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় মুদ্রিত আছে—" Right to Freedom"

১) All Citizens shall have the Rights—

a) To Freedom of speach and expression.

b) To assemble peaceably and without arms.

c) To form associations or Unions.

d) To move freely throught the the Territory of INDIA.

e) To reside and settle in part of Territory of INDIA.

উমর খালিদ কোনভাবেই উপরোক্ত ১৯ নম্বর ধারার উপধারাগুলি লঙ্ঘন করেননি। আজ থেকে প্রায় ৮ দশক আগে ভারত বিভক্ত হয়েছিল। সেই ভারত আজ তিনটি দেশে বিভক্ত। কাঁটাতারের বিভাজন সাধারণ মানুষকে এই উপমহাদেশে খন্ডিত ও খর্বিত করে রেখেছে। কিন্তু পুঁজির অবাধ চলাচলের কোনও কাঁটাতার নেই! পুঁজির তল্পিবাহকরা

নিদারুণ অসহায় ভুবনহীন মানুষদের 'ঘুষ পেটিয়া, উইপোকা' ছাপ মেরে সভ্যতার নির্মম, নিষ্করুণ অবমাননা করে যাচ্ছেন। ভারতের স্বাধীনতার প্রায় আট দশকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিতে মুখরিত জাগ্রত যুবশক্তির এই সময়ের প্রতীক উমর খালিদ তাঁর এক আত্মীয়ের বিবাহে মাত্র সাত দিনের জন্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর বিনা বিচারে জেল বন্দী থাকার পর এই প্যারোল! মানতেই হবে, দেশের প্রভুদের কী অসীম করুণা! অথচ, আসারাম বাপুর মতো লম্পট, ধর্ষক যোলবার প্যারোলে ছাড়া পেয়েছে যা' কোনমতেই ছ'মাসের কম নয়। এবং গুজরাট দাঙ্গায় জড়িত খুনি ধর্ষকরা না-কী সংস্কারী! যথেষ্ট চরিত্রবান ও তাঁরা এমন কুৎসিত বিকারগ্রস্ত হতেই পারেন না!

এই মহান ভারতের বিচার ব্যবস্থার পরিহাস, জেল থেকে নিঃশর্ত মুক্তি পাবে আসারাম বাপু'রা! আর, নিকষ, কালো অন্ধকারের কুঠরীতে বসে স্বপ্ন দেখবে শ্রেণীহীন এক গণতান্ত্রিক ভারতের। সভ্যতার প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপখানির ক্ষীণ শিখাটুকু উমর খালিদ সাম্প্রদায়িক ঝোড়ো হাওয়ায় কোনমতে রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন। এই কি তার অপরাধ!

সন্দীপ ঘোষের মত প্রশাসকেরা এখন সবক্ষেত্রে এই সরকারের চালিকা শক্তি

অলিভিয়া

রাজ্যে একদিকে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি অন্যদিকে তৃণমূল দলের ছোট, বড় নেতাদের দৌরাত্মে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেই সময় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের মেয়েটির নৃশংস মৃত্যু ও ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসলে আজকে পুরো রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যকে উলঙ্গ করে দেয়। অথবা উল্টোভাবে বলা যেতে পারে, যদি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই চরম দুর্নীতি, নৈরাজ্য না-থাকত তাহলে হয়তো ঐ পড়ুয়া মেয়েটিকে ওই ভাবে মরতে হত না। বরং বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বিষয় সামনে উঠে আসছে এবং সরকার যেভাবে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে তা'তে এটাই মনে হচ্ছে ধর্ষণ নয়; মূল উদ্দেশ্য ছিল খুন করা। পড়ুয়া মেয়েটি কোনও বড় দুর্নীতি হয়তো জেনে ফেলেছিল, ধর্ষণ বা তার আনুসাঙ্গিক ঘটনাগুলি হচ্ছে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনাকারীরা যথেষ্ট সফল। আজকে সারা রাজ্য জুড়ে যে-তীব্র আন্দোলন যা' এক উৎসবের চেহারা নিয়েছে তা আসলে এই মৃত্যুকে ঘিরে প্রতিবাদ উদযাপন। কিন্তু তা' তথাকথিত অরাজনৈতিক চেহারা বজায় রাখতে গিয়ে অনেকটা লিঙ্গভিত্তিক একটি ধর্ষণের বিচারকেন্দ্রিক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, এই মৃত্যুটি নেহাতই একটি বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে ঘটেছে। এবং সেটা শুধু আর জি কর বা স্বাস্থ্যদপ্তর কেন্দ্রিক। এবং ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রচার আর সহানুভূতির হাওয়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু প্রশাসনিক রদবদল কেন্দ্রিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ থেমে থাকছে না। কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি শাসকদলের বর্তমান জমানার একটি বৈশিষ্ট্য। এর মানে এটা নয় যে, এর আগে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছিল না। একদমই তা' নয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবসময়ই দুর্নীতির একটি বড় আখড়া। কংগ্রেস আমল, বাম আমল আলাদা কিছু নয়। কিন্তু বলা যেতে পারে তখন আন্দোলন, প্রতিবাদের অল্প হলেও একটি পরিসর ছিল। দুর্নীতি ছিল কিন্তু তা' এমন পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল না।

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলের শুরু থেকেই কতগুলি বিষম অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। একদিকে রাজ্য সরকার উদার বুর্জোয়া জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রবক্তা অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়দের রাজ্যের পরামর্শ দাতা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। জহর সরকারের মতন তথাকথিত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অবসর প্রাপ্ত আমলারা তৃণমূলে যোগ দিলেন। কিন্তু তাঁরা সরকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নটির দিকে চোখ বুজে রইলেন। আবার উল্টোদিকে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, সাধারণ কলেজ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানগুলির যে ন্যূনতম স্বশাসন ছিল তা' কেড়ে নেওয়া হল। কলেজগুলি নিজেদের স্বার্থে যে আংশিক সময়ের বা অতিথি শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারত তা' কেড়ে নেওয়া হল। তথাকথিত কেন্দ্রীভূত টেন্ডারের নামে কলেজগুলির নিজেদের প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে টেন্ডার করে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ খরচের অধিকার খর্ব করা হল। ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিষিদ্ধ করে কলেজে প্রিন্সিপাল মারফত তৃণমূলরাজ প্রতিষ্ঠা হল। জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি সহ বিভিন্ন ধরণের স্বশাসিত সংস্থাগুলির শুধু স্বশাসন খর্ব করা হল না, সম্পূর্ণভাবে বিরোধী শূন্য করা হল। ফলে সংসদীয় বিরোধী দলগুলি ও তাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থের কারণে ও কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যা কিনা একটি সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখে, তা সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়ে

গেল। ফলে সরকার ও তৃণমূলের দলীয় স্তরে দুর্নীতি ও অত্যাচারে খোলা ছাড়-এর পরিবেশ তৈরী হল। সরকারি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অধিকর্ত্তা এবং তৃণমূল দলের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে এক স্থায়ী দুর্নীতির সম্পর্ক তৈরী হল। সরকারি ক্ষেত্রে যারা এর বিরোধিতা করলেন তাদেরকে বদলি থেকে শারীরিক নিগ্রহ, কর্ম্মক্ষেত্রে অপমান করে তাদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল।

একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্বাস্থ্য সাথীর জনমুখী কিছু প্রকল্প আর অন্য দিকে সিভিক ভলান্টিয়ার সহ সরকারি কলেজে, পঞ্চায়েত সহ সব জায়গায় কম মাইনের চুক্তিতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হল। একদিকে চরম দারিদ্র ও বেকারির ফলে সাধারণ অনুদান প্রাপ্ত এক উপভোক্তা শ্রেণী তৈরী হল। আবার অন্যদিকে সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীন সুরক্ষাহীন এই কম মাইনের চাকরিজীবীরা বাধ্যতামূলকভাবে সুস্থ জীবনের তাগিদে প্রতিবাদহীনভাবে এই দুর্নীতিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। আর উপর দিকের অনুগত আমলাদের সামনে লক্ষ লক্ষ টাকার মাইনের পুনঃনিয়োগের টোপ। এইভাবে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এক সুন্দর কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির জাল তৃণমূল সরকার সাজিয়েছে। যা এতদিন পর্য্যন্ত মসৃণ গতিতে এগিয়েছে নির্বাচনী ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। এই দুর্নীতি, গণতন্ত্রহীনতা, স্বৈরাচার জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির বিভিন্ন প্রভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল না। একটি কারণ-তো অবশ্যই জাতীয় স্তরে সাম্প্রদায়িক বিজেপির উত্থানের ফলে আতঙ্কিত সংখ্যালঘুরা। তৃণমূলের শত স্বৈরাচার সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। তবে তৃণমূল বা তার আগের সরকার সবাই এক ধরণের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতে বলতে গেলে পুঁজিপতিদের এই সংকটে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়ে বিক্ষোভ বাড়তে দেয়নি। অর্থাৎ অভুক্ত জনগণকে বাসি রুটি দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থাতে ক্রম বর্দ্ধমান মুনাফার তাগিদ এবং কেন্দ্রীকরণের ফলে এই ধরণের স্থিতাবস্থা থাকতে পারে না। সামাজিক বিভিন্ন অসাম্য বাড়তে থাকে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। ফলে আন্দোলন, প্রতিবাদের জন্ম হয়। সামাজিক পরিস্থিতির কারণে, এখন প্রতি মুহূর্তে তৃণমূল সরকার এই ধরণের আন্দোলনের মুখোমুখি হচ্ছে।

আমি উপরে যা লিখলাম, তা' আমার অভিজ্ঞতা। আর এখন যা লিখব, তা' আসলে আমার এক বন্ধুর বলা একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে নেওয়া। অসম্ভব মিল! পশ্চিমবঙ্গের একটি মুসলিম প্রধান জেলার ছোট্ট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘটনা। আর জি কর-এর ঘটনাটি আপনারা জানেন। কলকাতা শহরের কেন্দ্রের একটি বিশাল মেডিক্যাল কলেজ-হসপিটাল হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ তার তুলনায় মফস্বলের একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছুই না। কিন্তু আমার বন্ধুর বয়ান থেকে আমি বুঝলাম, তৃণমূল সরকারের কর্ম্ম পদ্ধতি তা' শহরের বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল হোক আরজিকর থেকে ঐ ছোট্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, ওই জেলার যে রাজনৈতিক চলন তা' আলাদা কিছুই না।

কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র যে জেলার সেটিতে কিছুদিন আগে অবধি কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল এখনও তার রেশ আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি তৃণমূল সরকারে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই নির্বাচন ছাড়াই দখল করে অন্য সব জায়গার মতন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার কিছু দিনের মধ্যেই ওই কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক, কর্মচারীরা দল বেধে তৃণমূল ইউনিয়নে যোগ দেয়। শুধু যোগ দেয় বললে হবে না, যখন তৃণমূলের যে নেতার ইউনিয়ন কারিগরি দপ্তরে শক্তিশালী হয় সেখানে নিজেদের মধ্যে আপস করে চলে যায়। না-হলেই বদলি এবং লাঞ্ছনার প্রচ্ছন্ন হুমকি! পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং তাঁর কোটারির স্থানীয় কিছু কর্মচারী। অধ্যক্ষ পদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সেই যোগ্যতা ধারে কাছ দিয়েও যায় না। গত দশ বছর ধরে সে ঐ কারিগরি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, একজন সাধারণ বি ই পাশ। যদিও ঐ কলেজে দু'-একজন বাদ দিলে সবাই মাষ্টার ডিগ্রি অথবা পি এইচ ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত। তিনি মাসে কলেজে পাঁচ-ছ' দিনের বেশী থাকেন না। তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের অবাধ দাপট, জেলা তৃণমূলের মনোনীত পড়ুয়াদেরকে ষ্টুডেন্টস ওয়েল ফেয়ার কমিটিতে ঢোকানো হয়। পড়ুয়াদের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে টাকা তোলা হয়। সেই টাকা ব্যক্তিগত ব্যঙ্ক অ্যাকাউন্টে রেখে দেওয়া হয়, তার হিসেব দেওয়া হয় না।

বেশীর ভাগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান, প্লেসমেন্ট অফিসার, ভোকেশনাল অফিসার, হস্টেল সুপার বিশেষ কারণ ছাড়া পরিবর্তন করা হয়নি। অথচ কেন্দ্রীয় কারিগরি কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী দু'-বছর অন্তর পরিবর্তন করতে হয়। এবং এনারা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে পদাধিকার বলে বিভিন্ন ধরণের কেনাকাটা, খরচার অধিকার প্রাপ্ত। পাশাপাশি কারিগরি কলেজ হওয়ার ফলে জেলার সরকারী-বেসরকারি সিভিল, বিল্ডিং সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষার ও কাজের বরাত ঐ কলেজ পায়। কিন্তু তার কোনও হিসেব বাইরে আসে না। অফিসের দু'-একজন করণিক, আর ঐ বিভাগের একজন

শিক্ষকের মধ্যস্থতায় এই দুর্নীতি চলে এবং অন্য শিক্ষকদের মাঝে মাঝে কিছু টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সুত্রে প্রকাশ তদন্ত হলেই লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি প্রকাশ পাবে। হস্টেলের বাসন, খাট, খাদ্যদ্রব্য নিয়ে দুর্নীতি চলে। বিভিন্ন নতুন যন্ত্রপাতি এলে সাপ্লায়ারদের সাথে বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষের যোগসাজশে অচল যন্ত্র-পাতি পাশ হয়ে যায়; শুধু তাই নয়, ইন্সটলেশনের টাকার কোনও হিসেব পাওয়া যায় না, কারণ ইন্সটলেশন হয়ই না। ফলে ঐ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একটি স্থায়ী দুর্নীতির কোটারি বানিয়ে রেখেছেন। আপনি খুঁটিয়ে দেখলে সন্দীপ ঘোষের চেয়ে আলাদা করতে পারবেন না। আপনি বলতে পারেন কেউ প্রতিবাদ করে না ! আমি আমার বন্ধুটিকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম। উত্তর একই রকম দু'-একজন সাহস করে প্রতিবাদ করলে তাকে ধমকে চমকে ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়। আর-একজন পুরণো শিক্ষক এই প্রতিবাদ করলে তাঁকে একজন বিভাগীয় প্রধানকে দিয়ে সবার সামনে চরম অপমান করা হয়।এমনকি মারবার চেষ্টা করা হয়।

মফঃস্বলের কলেজ হওয়ায় বেশীরভাগ শিক্ষকের জেলার বাইরে বাড়িতে যাওয়ার তাগিদ থাকে তাদের সেই ছুট দেওয়া হয়, একটাই অলিখিত শর্তে দুর্নীতির প্রতিবাদ চলবে না। আর জি কর কাণ্ডে যেমন বের হয়ে আসছে যে পরীক্ষা পাশ করার জন্য বা এম ডি-তে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হত এখানেও কিন্তু কারিগরি কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে এরকম একটি চক্রের অভিযোগ বার বার করে উঠেছে। শুধু তাই বেসরকারি কারিগরি কলেজগুলিতে প্রশ্ন ফাঁস বা সরকারী-বেসরকারি সব জায়গাতে চরম টোকাটুকি একটি সাধারণ ঘটনা। হ্যাঁ, একটু পার্থক্য আছে। মেডিকেলের পড়ুয়ারা বেশীর ভাগই অর্থবান পরিবারের সন্তান, আর এখানে খুবই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা ছাত্র, তাই খুব বেশী অর্থের দাবী হয় না। পাশাপাশি শিক্ষক, প্রশিক্ষক, চালু যন্ত্রপাতির অভাবে শিক্ষকেরা হতাশ থাকেন। আর এখানে ডাক্তারদের মতন প্রাইভেট প্র্যাকটিস না-থাকলেও প্রাইভেট টিউশন চালু আছে। সুতরাং দুর্নীতির বিছানো জালে সবাই আটকা।

সুতরাং তৃণমূল সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির একটি জাল তৈরি হয়েছে। যেটি পশ্চিমবাংলায় আগে কখনো দেখা যায়নি। তবে এটিও ঘটনা সারাদেশের ক্ষেত্রেও যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, দুর্নীতির কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা বর্তমান ফাটকা পুঁজিবাদ এবং সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সব জায়গায় কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে আসছে। শুধু তাই নয়, একের-পর-এক সরকারের পতন ঘটেছে দুর্নীতির কারণে।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে তার চেয়ে আলাদা কিছু হবে না; এটাই স্বাভাবিক। উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে আবার আন্দোলনের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে; যদিও তা ঘটেছে পুঁজিবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে। আন্দোলনগুলি শুধু ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করছে-না, সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের সামূহিক দুর্নীতির ফলে আক্রান্ত জনগণ যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকেও লিঙ্গ, জাত, ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করছে। এর চেহারা আমরা বাংলাদেশের আন্দোলন থেকে আর জি কর আন্দোলনে দেখতে পাচ্ছি।

শেষে আমি আবার আমার কথায় ফিরে আসছি, আজকের পশ্চিমবঙ্গে আর জি করের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনাটি যেভাবে এটি শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের সমস্যা বা স্বাস্থ্য বিভাগের সমস্যা হিসেবে দেখান হচ্ছে তা' নয়, এটি একটি সার্বিক সমস্যা। অথচ আন্দোলন যেভাবে জুনিয়র ডাক্তার কেন্দ্রিক এবং কিছুটা লিঙ্গ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে তা' শাসককে সুবিধে করে দিয়েছে। তাই, সন্দীপ, অভীক, বিরূপাক্ষদের মত লোকেরা আজকে সব জায়গায় রাজনৈতিক আশীর্বাদ ধন্য হয়ে প্রশাসকের পদে বসে আছে; কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির অস্ত্র হিসেবে।

প্রশ্নটা সামাজিক ন্যায়ের, সাম্যের

কৌশিক ব্যানার্জ্জী

মাথার উপর বেলা দু'টোর গনগনে সূর্য্য। সকলেই শাড়ি, ওড়নার খুঁটে মাঝে মাঝেই ঘাম মুছতে বাধ্য হচ্ছে। সকলেই মানে, এক্সোডাসের মহিলা শ্রমিকরা। ২৪ ঘন্টা ধর্ণা আন্দোলন চলছে তাদের কারখানার গেটে। মালিক লক আউট ঘোষণা করেছে। শ্রমিকদের মূল দাবি— তাদের পিএফের টাকা চুরি করা চলবে না, অবিলম্বে সেই টাকা পিএফ অফিসে জমা দিয়ে কারখানা খুলতে হবে। বাড়ির যাবতীয় কাজ সেরে যে যখন পারছে আন্দোলন মঞ্চে হাজির হচ্ছে। ''রাতে এখানে থাকা নিয়ে স্বামীরা আপত্তি করছে না ?'' এই প্রশ্নে এক মহিলা শ্রমিক ঝাঁঝিয়ে উঠল, ''করেছিল, সাফ বলে দিয়েছি আমাদের হকের টাকা আদায়ের জন্য যা যা করার আমরা করবই। এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'' শ্রমিকদের লড়াই, নারীদের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধকে কতখানি উস্কে দিতে পারে তা' চাক্ষুষ করলাম। নারী আন্দোলন ও লিঙ্গসাম্য নিয়ে

দশটা সেমিনারও সম্ভবত এই শিক্ষা দিতে পারে না। আপোষহীন শ্রমিক সংগ্রাম কেবল অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, ভেদাভেদের বিরুদ্ধেও নির্মিত হয় এক উন্নত চেতনা।

চলছে রোজার মাস। মুসলিম নারী শ্রমিকদের উপর চাপটা আরও বেশী। সেই রাত তিন'টেয় উঠে রান্নাবান্না, সূর্য্য ওঠার আগেই খাওয়া-দাওয়া সারা। তারপর ঘর গেরস্থালি সামলে, সারাদিন উপোস করে ধর্ণা মঞ্চে হাজির হওয়া নিয়ে হিন্দু শ্রমিকরা রীতিমত উদ্বিগ্ন। বিকেল-বিকেল হিন্দু শ্রমিকরা ফল, মিষ্টি সহ হাজির। মুসলিম বোনেদের রোজা ভাঙ্গার কথা বিলক্ষণ মাথায় আছে। শধু তাই নয়, গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলল, ''রোজার মাসে ওদের খুব সমস্যা, এখন হিন্দুদেরই বেশী দায়িত্ব নিতে হবে।'' লড়াই এবং সংগ্রামই পারে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ সংক্রান্ত যাবতীয় ভেদাভেদ মুছে দিতে। এটা হল সৎ লড়াইয়ের বস্তুগত উপাদান। শ্রমিকরা জানে মালিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের মূল সম্বল হল একতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে, তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহে বা প্রবহমান বিবিধ লড়াইয়ের ইতিহাস আমাদের বারবার শেখায়, মেহনতি মানুষের উদ্যোগ এবং স্বার্থে গড়ে ওঠা লড়াই— ধর্ম, জাতি, ভাষার ভিন্নতাকে ছাপিয়ে যায়। ছাপিয়ে যায় কারণ সেই সংগ্রাম তাদের কানে ধরে শেখায়, মানুষের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় জীবন-জীবিকার সংগ্রামের পথে কোনও ভাবেই অন্তরায় নয়।

শ্রেণি বিভক্ত সমাজে প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তি বৈশিষ্ট সত্ত্বেও তারা শ্রেণি স্বার্থের প্রতিনিধি। সমাজে শোষক শ্রেণি তার উন্নত অবস্থানের কারণে সে-সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। শ্রমিক শ্রেণির বড় অংশই ঐতিহাসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া। ফলে জ্ঞানের আলোকে তার পক্ষে অনুধাবন করা মুশকিল তার নির্দিষ্ট শ্রেণি অবস্থান ও কর্তব্য। এ কাজে সহায়ক হল সৎ, আপোষহীন লড়াই। সেই লড়াই তার শ্রেণির প্রকৃত সত্ত্বাকে টেনে বার করে। বাতাসের মত সর্বক্ষণ উপস্থিত এবং প্রবহমান শ্রেণিদ্বন্দ্বে তার ভূমিকা বুঝে নিতে সাহায্য ক'রে। সেই চেতনা নিছক জ্ঞান চর্চ্চার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত্ব করা অসম্ভব। সংগ্রাম এবং লড়াই ছাড়া ব্যক্তি শ্রমিক, বিবিধ সামাজিক পরিচয়ের গন্ডি পার ক'রে তার শ্রেণি সত্ত্বাকে আয়ত্ত্ব করতে অপারগ। এক্সোডাস ফিউচুরার শ্রমিকদের লড়াই চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই সত্যকে দেখাচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, এমন একটা লড়াই থেকেই তারা তাদের প্রকৃত শ্রেণি অবস্থান এবং শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক কর্তব্য সামগ্রিক ভাবে বুঝে নিতে পারে না। কিন্তু এক লাফে অনেকটা রাস্তা পার হয়েছে তা' নিয়েও সন্দেহ নেই। ২২ দিনের লড়াই শ্রেণি চেতনার প্রাথমিক স্তরের জন্ম দেয়, লড়াই হয়ে ওঠে এক চেতনার আন্দোলন।

এক্সোডাস ফিউচুরা নিট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

এই কোম্পানিটি স্থাপিত হয় ২০১১ সালে। এর অবস্থান দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর মৌজায়। সোনারপুর রেল স্টেশান থেকে আনুমানিক দূরত্ব ২ কিমি। এখানে প্রায় ৭৫০ জন শ্রমিক কাজে লিপ্ত। তার মধ্যে ৭০০ জন নারী শ্রমিক। মূলত নানাবিধ গেঞ্জি এখানে তৈরী হয়, মূলত রপ্তানীর লক্ষ্যে। মাইনে মোটামুটি ১১ হাজার থেকে ১২,৪০০ টাকার মধ্যে।

কাজের পরিবেশ

কারখানায় কাজের সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫.৩০'টা। দুপুর ১২'টা থেকে ১-৩০ পর্য্যন্ত তিন ভাগে খাবার বিরতি দেওয়া হয়। কোনও বিভাগে কেউ সামান্য সময়ের জন্যও খালি বসে থাকে না। হাতের কাজ ফুরোতে না ফুরোতেই অন্য কাজ চলে আসে। যাতে জল খেতে উঠেও সময় নষ্ট না-হয়, তার জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোবাইল ফোন রেখে ঢুকতে হয়। সারা দিনে কারোর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই। বাড়ি থেকে কোনও প্রয়োজন হলে কারখানায় ইন-চার্জকে ফোন করে জানাতে হয়। সারাদিনে আধ ঘন্টার খাবার বিরতিতে যেটুকু ফোন করার ফুরসত মেলে। মাঝে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য কার্ড নিতে হত। মানে একজন একটা কার্ড নিয়ে গেলে অন্য কারও পক্ষে আর যাওয়ার উপায় ছিল না। শ্রমিকরাই লড়ে সেই কার্ড প্রথার অবসান ক'রে।

টানা ৮ ঘন্টা, সপ্তাহে ৬ দিন দাঁড়িয়ে কাজ, যেখানে হাত ও চোখের কাজই মূল। অধিকাংশ শ্রমিক-ই অসহ্য কোমর-হাঁটু-পায়ের যন্ত্রণা, মাথা ও চোখের ব্যাথায় ভুগছেন। অনেকেরই শরীরে নানাবিধ অস্ত্রোপচারের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিটি ঘরে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। তাছাড়া ইনচার্জরা-তো থাকেনই। কাজের ফাঁকে নিজেদের মধ্যে সামান্য কথা বলারও সুযোগ হয় না। ''গল্প করবে না। কাজ শেষ করো, ক্রমাগত তাড়া খেতে হয়। আমার হাত থেকে ওর হাত, তার থেকে আর-এক জনের হাত, এতটুকু সময় নেই''— তাঁদের কথা বলা, অভিব্যক্তিতেই যেন কারখানার অবিরাম টেনশনটা ধরা পড়ে যায়। এই শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই মালিক পক্ষের ঘনিষ্ঠ মেয়েদের লিডার বানানো হয়।

তাঁদের কাজ চাপ দিয়ে টার্গেট পূরণ করানো।

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'— বাড়ির গৃহিণী থেকে শ্রমিক হয়ে ওঠার গল্প

সংসারে অভাবের কারণে বাড়ির গৃহিণীরা এলাকার কারখানায় কাজ করতে এল। তাদের ভাষ্যে, আমাদের বাড়ির মহিলারা কেউ কখনও কাজের জন্য বাইরে পা রাখেনি। সেই মেয়েরাই এসে পড়ল আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রে। জড়িয়ে পড়ল উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সামাজিক সম্পর্কে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক তাদের ধীরে ধীরে বোঝাল মালিকের ধর্ম্মই হল শোষণ করা, বিপরীতে সর্বহারাদের আশু কাজ হল নিদেনপক্ষে এই শোষণের মাত্রাকে সহনীয় মাত্রার মধ্যে রাখা এবং দূরবর্তী লক্ষ্য হল এই উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান করা। নিরন্তর চলতে থাকা টানাপোড়েনের মধ্যে যন্ত্রণা, শোষণের স্বীকার যেমন হতে থাকল, তেমনই ছোট-ছোট লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হল সর্বহারা চেতনা যা অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের থেকেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। কীভাবে হল, সেই গল্পে নজর ফেরানো যাক।

২০১১ সালের ১ আগস্ট, সোনারপুরে যখন এই কারখানা তৈরী হয়, তখন এলাকার মহিলারা কিছুই বুঝতেন না। সেই সময়ে, মহিলা শ্রমিকেরা কাজ করতে শুরু করেছিলেন মাত্র ১০ টাকা দৈনিক মজুরীতে। মানে মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা। সেই সময়ে কারও কোনও সম্যক ধারণাই ছিল না পিএফ কী, তা' বাকী আছে কি-না, স্যালারি স্লিপ রাখতে হয় কী-না ইত্যাদি বিষয়ে। টাকাটুকু হাতে পেয়েই তাঁরা খুশি থাকতেন। প্রশিক্ষণ পেয়ে, মেশিন চিনে, নতুন কাজ শেখার উদ্যম ও আগ্রহ ছিল বেশী। ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা। বাড়তে থাকে প্রোডাকশানের চাপ। টার্গেট দেওয়া হতে থাকে শ্রমিকদের। বর্তমানে প্রতি ১৫ মিনিট পিছু টার্গেট পূরণ হয়েছে কী-না সেই হিসেব নেওয়া হয়। দিন পিছু টার্গেট পূরণ না-হলে ছুটির পরে কাজ করে পুষিয়ে দিতে হয়। এর জন্য কিন্তু ওভারটাইমের পয়সা দেওয়া হয় না।

কাজ বেড়েছে, বেড়েছে টার্গেটের চাপ। সেই তুলনায় বেতন বেড়েছে কতটা? ৩০০ টাকা প্রথম মাসে দেওয়ার পরে, পরের মাস (সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে) দেওয়া হতে থাকে ১৮০০ টাকা। তখন দেওয়া হত 'মিড-ডে মিল' বা দুপুরের খাবার। এছাড়া ছিল হাজিরা বোনাস ৩০০ টাকা। কিন্তু, কেউ একদিনও কামাই করলে এই ৩০০ টাকার পুরোটা-তো বটেই তার অনুপস্থিতির দিনের মাইনেও কেটে নেওয়া হত। তারপর বলা হয়েছিল প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে মাইনে বাড়ানো হবে, আসলে একসঙ্গে বাড়ালে তো ওদের (মালিক পক্ষের) গায়ে লাগত, তাই এই ব্যবস্থা করেছিল। তখন থেকে আস্তে আস্তে আমাদের টার্গেট দেওয়াও শুরু করেছিল। ৪টে থেকে ৫টা। ৫টা থেকে ৬টা এরকম করে বাড়াচ্ছিল, যাতে মেয়েরাও প্রথমে বুঝতে না পারে— জানালেন এক মহিলা শ্রমিক।

প্রথম বড় বিরোধের সূত্রপাত ২০১৩ সালে। সেই বছর কোম্পানি বড় জেনারেটর বসায় এবং শ্রমিকদের বলে দেওয়া হয়, এই খরচের জন্য এই বছর বোনাস দেওয়া সম্ভব হবে না। ঘটনাচক্রে সেই বছরেই কয়েক জন শিক্ষিত মহিলা শ্রমিক যোগ দেন, তখন থেকেই ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে নানান আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি। এরপরই শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে বোনাসের দাবিতে, মাইনে বাড়ানোর দাবিতে। ২০১৩ সালে বিভিন্ন গ্রেড অনুসারে একবারই বড় মাপে মাইনে বাড়ানো হয়, সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা। তারপর থেকে খুবই সামান্য পরিমাণে কখনও কখনও মাইনে বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সাল পর্য্যন্ত এর তাও একটি ধারাবাহিকতা ছিল। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকেই চূড়ান্ত শোষণ শুরু হয় বলে শ্রমিকদের দাবি।

বর্তমানে যে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, তার বীজ বপন হয়েছিল ২০২২ সালে। সে সময়ে শ্রমিকেরা জানিয়েছিলেন বেসিক-পে অর্থাৎ পিএফ (পিএফ চালু হয় ২০১৩ সাল থেকে), ইএসআই বাদ দিয়ে মাইনে ৫০০ টাকা বাড়াতে হবে, যে দাবি কোম্পানি তখন মেনে নেয়নি। তার প্রতিবাদে মহিলা শ্রমিকেরা লেবার কমিশন-এর সাথে যোগাযোগ করেন। সেই প্রথম শ্রমিকরা জানল শ্রম-পুঁজির দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা করার জন্য আছে সরকারি শ্রম দপ্তর, শ্রম ট্রাইব্যুনাল, কোর্ট ইত্যাদি। যদিও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মোহভঙ্গ ঘটেছে।

এক শ্রমিকের জবানিতে— ২০১১-এ কারখানায় কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে এক্সোডাস, আর বাড়ি ছাড়া কিছুই জানতাম না আমরা। এই সিইও এসে আমাদের থানা, লেবার কমিশন অফিস এসব করতে শিখিয়েছেন। ২০২২-এ শুরু হয় মাইনে বাড়ানোর জন্য আন্দোলন। শ্রমিকদের দাবি ছিল ৫০০ টাকা বাড়াতে হবে, মালিকের প্রস্তাব ছিল ৮০ টাকা বাড়ানো হবে। শ্রমিকরা বাধ্য হল দীর্ঘ ৪৫ দিন ধর্মঘট করতে। ম্যানেজমেন্ট ৩৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে, কিন্তু শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙতে পারেনি। তাঁরা অনমনীয় থাকে যে, ওই ৩৩ জন

শ্রমিককে নিয়েই কাজে যোগ দেবে; না হলে কেউ যোগ দেবে না। মালিক মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই আন্দোলনে মধ্যস্থতাকারি হিসেবে তৃণমূলের কিছু আঞ্চলিক দাদারা ঢুকে পড়ে এবং শ্রমিকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজে যোগ দেওয়ায়। ৮০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি মেনে নেয় শ্রমিকরা।

এবারের আন্দোলন

২০২২ সালে লড়াইয়ের দাবি আদায় না হলেও তা' আগামী দিনের লড়াইয়ের ভিত গড়ে দিয়ে যায়। শ্রমিকরা তাই এবারের আন্দোলনে কোনও প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মুরুব্বিদের ঢুকতে দেয়নি। ২০২২ সালের পর মাইনে বাড়ছিল না কোনভাবেই। দীর্ঘ টালবাহানার পরে ২০২৪ সালে মাইনে বাড়ে। মাইনে বাড়ানোর দড় কষাকষির সময় আলোচনার ঘরে পড়ে থাকা কিছু পে-স্লিপ হাতে পেয়ে যান কয়েক জন শ্রমিক। চূড়ান্ত বিস্ময়ে দেখেন তাঁদের বেসিক-পে (মূল মাইনে) কমিয়ে দেওয়া হয়েছে! যেখানে আগে বেসিক পে ছিল ৬৮০০ টাকা তা' কমিয়ে ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হয়; যার মানে, পিএফ-ও কমে যাওয়া। তাঁরা দেখেন, পিএফ-এর টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পিএফ অ্যাকাউন্টে অর্দ্ধেক টাকা জমা পড়েছে। সেখানে ৮০০ টাকার জায়গায় জমা পড়েছে ৪০০ টাকা ও বাকি ৪০০ টাকা বকেয়া পড়ে আছে। শ্রমিকরা চেপে ধরাতে বস্তা থেকে কেউটে বেরিয়ে আসে। ম্যানেজমেন্ট জানায় শ্রমিকদের খাত থেকে কেটে নেওয়া টাকা জমা দেয়নি ৩৩ মাস এবং মালিকের দেয় টাকা জমা পড়েনি ৪২ মাস। মানে দীর্ঘদিন থেকেই পিএফের টাকা জমার ক্ষেত্রে লাগাতার বেআইনি কাজ হয়েছে। পিএফ কমিশনারের তরফ থেকেও তেমন কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের মুখে কুলুপ। এমন বেনিয়ম করেও মালিক কিন্তু দিব্যি রসেবসে আছে। আইন, আদালত তার টিকিও ছুঁতে পারেনি বা তেমন কোনও প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি।

২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পে-স্লিপ হাতে পেয়ে কিছু শ্রমিক বুঝতে পারে নিয়মমাফিক পিএফ জমা পড়ছে না। সেই দাবিতে শ্রমিকেরা গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সাল থেকে আন্দোলনে নামে। প্রথমে কারখানার ভেতরে চলছিল প্রতিবাদ আন্দোলন। ২০ ফেব্রুয়ারী তাঁদের জানানো হয়, তাঁরা যেন কাজ শুরু করেন, মালিক পক্ষ কারখানায় এসে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। সকাল ৯টা থেকে ৫.৩০'টা পর্যন্ত তাঁদের কাজ চলার পরে শ্রমিকরা জানতে পারেন, মালিক ও পুরো ম্যানেজমেন্ট টিম রামচন্দ্রপুর পঞ্চায়েত অফিসে মিটিং করে চলে গেছেন। মালিক ফোন করে দেন এবং তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ২১ ফেব্রুয়ারি কারখানায় এসে শ্রমিকেরা দেখেন কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছে। গেটে তালা। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে মূল ফটকের বাইরে অবস্থান শুরু করেন মহিলা শ্রমিকেরা।

তাদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে জানা যায়, কারখানার ভিতরে প্রচুর মাল জমে আছে। মালিক সেই মাল যাতে বাইরে আনতে না-পারে সে কারণেই তাদের ২৪ ঘন্টা ধর্ণা অবস্থান চলছে। অবস্থান মঞ্চে শ্রমিকদের অনমনীয় মনের জোর ছিল দেখার মত। তার সঙ্গে ছিল শ্রমিকের যথা-বিধি ডিসিপ্লিন। শান্ত কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রুশ বিপ্লবের সময় ট্রটস্কি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "Those who intend to disrupt the capitalist production process must remain most calm, composed & discipline." এই শ্রমিকরা কেউ ট্রটস্কির লেখা বা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়েনি কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের অতি গভীর কথা লড়াইয়ের ময়দানে নেমে বুঝে গেছে।

মালিক বুঝতে পারে কোনও ভাবেই আন্দোলনকে ভাঙ্গা যাবে না, বাধ্য হয় ১৫-ই মার্চ সোনারপুর থানায় আলোচনায় বসতে। থানায় আলোচনা! পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের দাবি-দাওয়ার আলোচনায় মধ্যস্থতা করছে থানা! তার মানে থানার বড় বাবু! সরকারি শ্রম দপ্তর নয়! শ্রমিকের দাবি এখন এই পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তৃণমূল সরকার! উর্দ্দিপড়া পুলিশ ধমকাবে-শাসাবে অনৈতিক প্রস্তাব মানতে বাধ্য করবে। পুলিশ-মালিক বোঝা-পড়া হতে আর কতক্ষণ! জনগণের এই অভিজ্ঞতা নিত্যদিনের। সম্ভবত কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হল শ্রমদপ্তরকে।

শ্রমিকদের দাবি ছিল, অবিলম্বে পিএফের টাকা জমা দিতে হবে। বেসিক-পে কমানো যাবে না। কাজ ছেড়ে দেওয়া শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। মালিক বাধ্য হয় সবকটা দাবি মেনে নিতে। শ্রমিকদের পক্ষে ৬ জন প্রতিনিধি ছিল সেই আলোচনায়, কিন্তু সেই টেবিলেই তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেনি। মঞ্চে ফিরে এসে সকলের মতামত সাপেক্ষে প্রত্যেক শ্রমিকের সই সহকারে সেই চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করা হয়। স্থাপিত হয় শ্রমিক আন্দোলনে প্রকৃত গণতন্ত্র। এমন দৃষ্টান্ত এ দেশে আছে বলে মনে হয় না। রুশ বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলি এভাবেই পরিচালিত হত। এটিই হল শ্রমিক শ্রেণির গণতন্ত্র।

প্রশ্নটা ন্যায়ের-গণতন্ত্রের, শুধু অধিকারের নয়

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ দেশ ও কাল অনুযায়ী বিবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। দেখা যাবে প্রত্যেকটি সংগঠন পূর্বের তুলনায় নিজেকে ন্যায় ও অধিকারের প্রশ্নে অধিক গণতান্ত্রিক মনে করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে চালু রিপাবলিকের ধারণার জন্ম হয় ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। দুই শতাব্দী পার করে এসেও বলা যেতে পারে সেই বিপ্লব সঞ্জাত সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। এর কারণ হল, পুঁজিবাদী উৎপাদন আজও গোটা বিশ্বে প্রাধান্যকারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ফরাসী বিপ্লব ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম রাজনৈতিক ভিত্তি। আইনি ভিত্তি। একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে প্রোথিত করার জন্য চাই আইনি অনুমোদন। সেই অনুমোদনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের ভূমিষ্ঠ সন্তানের ওষ্ঠে, Declaration of the rights of men and citizen—এই নামে। ফরাসী বিপ্লব বলতেই মনে আসে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা', এই তিনটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি। সন্দেহ নেই, এই ধারণাগুলি এবং তার উপর রচিত আধুনিক প্রজাতন্ত্রের রয়েছে এক অসামান্য ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু এর গভীরে গিয়ে দেখা দরকার তার ভিতরে কী এমন জীবাণু রয়ে গেছে যার ফলশ্রুতি বর্তমানে পৃথিবীজোড়া এক ভয়ানক অসাম্যের কাঠামো। Declaration-এ বলা হয়েছিল, 'Men are born free and equal in rights. Social distinction may be based only on common good'। অর্থাৎ সকলেই সমান এও যেমন স্বীকৃত সত্য, আবার সামাজিক অসাম্যকেও বৈধতা দেওয়া হল বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের খাতিরে। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, যে-বিপ্লব সাম্যের বাণীর জন্য আজও সমাদৃত তার প্রথম ধারাতেই কেন রাখতে হল অসাম্যের কথা! তার জন্যে পরের ধারাতে চোখ বোলাতে হবে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'The aim of every political association is the preservation of natural rights of man. These rights are liberty, property, safety and resistance to oppression।' উঠে এল অধিকারের প্রশ্ন। স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার সর্বজনীন অধিকারের বিষয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়; কিন্তু সম্পত্তির অধিকারের আইনি নিরাপত্তা কেন? এখানে কিন্তু বলা হল না বা আজও কোনও পুঁজিবাদী দেশে বলা হয় না, এই সম্পত্তি কি ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য না কি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সেই সম্পত্তি (পড়ুন পুঁজি) ব্যবহৃত হতে পারে? এখানেই প্রোথিত থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বৈধতা। Declaration কিন্তু স্পষ্ট করে বলছে না, এই সম্পত্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সামাজিক ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। মানে, ঐতিহাসিক ভাবে যে অসাম্যের সমাজ চলে এসেছে তার বিলুপ্তি চাইছে না, বরং চাইছে তার আরও বৃদ্ধি। এই অনুমোদন কি সামাজিক সাম্য এবং ন্যায়ের পথে এক চূড়ান্ত বাধা নয়? অন্যান্য যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে তাঁর সাথে কী বিরোধাভাসে জড়িত নয় এই সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নটি?

(ঋণ স্বীকার: https//www.groundxero.in/2025/03/15/women-workers-struggle-at-exodus-knitting-factory)

ও আমার দেশের মাটি: আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস ২০২৫

কোয়েলী গাঙ্গুলী

৮ মার্চ ২০২৫, সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের অখ্যাত গ্রাম ভুবনেশ্বরী বাণীতলায় শ্রমজীবী নারী দিবস পালিত হল। খোলা মাঠে দুপুরের রোদ্দুর মাথায় নিয়ে প্লাষ্টিকের ওপর বসে আছেন দূর দূর গ্রাম থেকে আসা শ'দুয়েক মহিলা। কোন সকালে তারা রওনা দিয়েছেন, কী খেয়ে এসেছেন এসব প্রশ্ন বাহুল্য। উত্তর আঁকা ছিল তাদের শ্রান্ত ক্ষিণ্ন মুখগুলোতে। প্রকৃত উত্তর ছিল আরও গভীরে। নারী ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক গলিঘুঁজির হাল-হদিস জানা শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মননে সে কথার সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্ব এতটাই যে, মাপের হিসেব করা কঠিন। তার বাস্তবতার চাবুকের ঘা কতটা যন্ত্রণাদায়ক কানে শুনে চোখে দেখেও বুঝিবা বিশ্বাস হয় না। সেই অবিশ্বাস্য জীবনটাই ওরা যাপন করেন। ক্লান্ত ক্লিষ্ট একরোখা মুখে সাজেদা শেখ, জারিনা শেখ, মহিমা বিবি, অনিতা সামন্ত'রা মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেই নারীবাদের ক্ষুরধার যুক্তিরা অবশ অক্ষম হয়ে পড়ে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার ঘেরাটোপের নির্বিঘ্নতায় বাস করে এই নারীদের জীবন বোঝা সম্ভব নয়। রোদ ক্ষিদে ক্লান্তিরা তখন একজোট হয়ে শ্রমজীবী নারী দিবসের ডানাতে ভর করে তাদের নিজস্ব অধিকারের উড়াল দেয়।

একে একে উঠে আসে মুখেরা। মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে দ্বিধা কাটতে যতটুকু সময়। গলগল করে উদগীরণ হয় লাভা। সে লাভাস্রোতে মিশে থাকে কান্না, ঘাম, দলা পাকানো মাংসপিন্ড, খুবলে নেওয়া চোখ, মৃত প্রিয়জনের হারিয়ে যাওয়া

জামা, বনদফতরের রক্ষীদের নির্মম অত্যাচার, ক্ষুধার্ত সন্তানকে খেতে না-দিতে পারার অসহায় যন্ত্রণা। জল জঙ্গল নদী ঘেরা জীবনের শন্থুরে মুগ্ধতাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে উঠে আসে আর্তনাদের তীব্র উচ্চারণ, আর রক্তের জঘন্য পচা গন্ধ।

মেয়েরা নদীতে যায় মাছের চারা মীন ধরতে। নদীর পাড়ে থাকা ফড়েরা কিনে নেয় সেই মীন। সাত আট ঘন্টা জলে দাঁড়িয়ে দিনের শেষে ৭০-৮০ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরে ওরা। সেই টাকায় ছেলেমেয়েদের মুখে দু'টো ভাত তুলে দিতে পারে। শুধু মীন ধরাই নয় জাল আর নৌকো নিয়ে মোহনায় মাছ ধরতে যায়। স্বামীরা জঙ্গলে যায় মধুর খোঁজে। মেয়েরাও সঙ্গে যায় সুবিধা মতন। তবে ঘরে ছোট বাচ্চা থাকলে সেসব সম্ভব হয় না। লেখার মতন এতটা সহজ নয় বিষয়টা। ছকিনা বিবি বলেন, বিএলসিকার্ড (বোট লাইসেন্স কার্ড) দেখাতে না-পারলেই বনদফতরের কর্মীরা কেড়ে রেখে দেয় জাল আর নৌকো। শূন্য হাতে ফিরে আসে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে। কী এই বিএলসি কার্ড? বনদফতর থেকে দেওয়া একটি অনুমতি পত্র। ইতিহাস ঘেঁটে যেটুকু পাওয়া যায় ব্রিটিশ আমলে এটি দেওয়া হত মূলত কাঠব্যবসায়ীদের কাঠ বইবার অনুমতিপত্র হিসেবে। সুন্দরবনে গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কাঠ ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিএলসি কার্ডের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে যাবার কথা। পুরনো নথিপত্রও বনদফতরের কাছে নেই। সে সবই নাকি চলে গেছে খুলনায়। সেই কার্ডই রিনিউ করে এখন দেওয়া হয় মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা, মীন ধরার জন্য। এটি হাতে থাকলে তবেই জঙ্গলে কিংবা নদীতে যাওয়া যাবে।

২০২১ সালের একটি সমীক্ষাতে দেখা গেছে সক্রিয় বিএলসি কার্ডের সংখ্যা ৯২৪। আর মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের সংখ্যা ১৪০০০০। শেষ কবে বিএলসি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে বনদফতরে কর্মীরাও জানে না। যে আইন ওদের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য কিনা তা বনদফতরেরই ঠিকমতন জানা নেই তার ভিত্তিতেই আইন বে-আইনের তকমা লাগিয়ে পেটের ভাত মারছে সরকার। এসব-তো আইনের কূটকচালি। অর্থনৈতিক অবস্থার ফেরে লেখা-পড়া না-জানা, বা অল্প জানা ওই মানুষদের কাছে এর চাইতে ঢের সহজ বাঘের হাতে মরা। এত বছর অবাধে জঙ্গলে নদীতে মাছ, কাঁকড়া, মীন ধরে বেড়ানো মানুষগুলো দিশাহারা। যে নদী জল জঙ্গলকে ওরা নিজেদের বলেই জেনে এসেছে এতকাল, আজ তার কাছে যেতে হলে অনুমতি পত্র (পড়ুন বিএলসি কার্ড) লাগে। সেই বিএলসি কার্ডের সংখ্যাটাও আমরা দেখলাম। মানুষগুলো কী করবে এখন? সেটাও বললেন বছর ষাটের ময়লা আটপৌরে শাড়িতে আধমাথা ঘোমটা টানা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কুঁচকে যাওয়া চামড়ার আরতি সামন্ত। মাইক নিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, ''যার বিএলসিকার্ড আছে তার নৌকো নেই, যার নৌকো আছে তার বিএলসি কার্ড নেই। যার বিএলসি কার্ড আছে সে বিএলসি কার্ড ভাড়ায় দেয়, যার নৌকো আছে সে নৌকো ভাড়ায় দেয়।'' সেই ভাড়ার টাকাটাও কম কিছু নয়। বিএলসি কার্ডের ভাড়া ষাট-সত্তর-আশি হাজার টাকা, যে যেমন পারে নেয়। নৌকোর ভাড়াও কাছাকাছি। ফলে খাবার জন্য হাতে পড়ে থাকে পেন্সিল। কানে আসে প্রৌঢ়ার আর্তনাদ, ''কী খাব আমরা? আমরা কি মানুষ নই? নৌকো, জাল কেড়ে রেখে দেয় বনদফতর। ওরা চায় আমরা মরে যাই। কিন্তু আমরা মরব না। আমরা সবাই মিলে একজোট হয়ে সরকারের কাছে যাব। দাবি জানাব। আমাদের পেটের ভাতের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। মানবাধিকার সংগঠনের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরাও যে মানুষ এই কথাটা সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে।''

এর আগেই কান্না জড়ানো অসহায় গলায় তিন সন্তানের মা (যার মধ্যে দু'জনই নাবালক) রহিমা বিবি বলেছেন, বাঘের আক্রমণে মৃত অথচ সরকারী খাতায় না-মরা স্বামী আবুর আলি মোল্লার কথা। সঙ্গীদের চোখের সামনে নৌকো থেকে বাঘে তুলে নিয়ে গেল মানুষটাকে। বনদফতরকে তক্ষুণি খবর পাঠান হল। তাতে বনদফতরের কী! অনেক আবেদন নিবেদনের পর অবশেষে দিন সাতেক বাদে উদ্ধারকারী দল যায় খোঁজ করতে। যায় ঠিকই, কিন্তু সে-তো নাম কা ওয়াস্তে। কোর এরিয়া যাবার সদিচ্ছা তাদের কোনও কালেই ছিল না। আজও নেই। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে অত ভিতরে যাবার মতন ব্যবস্থাপত্র তাদের কাছে নেই। ফল কী দাঁড়াল! মানুষ যে মরেছে সেটিরই প্রমাণ গায়েব। যে মানুষ মরেইনি তার আবার ক্ষতিপূরণ কীসের? তিনটি সন্তান নিয়ে অনাহারে মরা ছাড়া রহিমা বিবির কাছে আর কোনও পথ-তো আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

জারিনা শেখ বললেন, ''এপ্রিল-মে-জুন, এই তিনমাস নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকে। কারণ মাছেরা তখন ডিম ছাড়ে। আমরাও তখন নদীতে নামি না। কিন্তু খাব কী? এমনি সময়ই আধপেটা খাই, আর তখন ভুখা পেটে মরি। তার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা করেছে?'' আরতি সামন্ত চিৎকার করে বলেন, ''যাদের হাজার-লক্ষ-লক্ষ টাকা আছে সরকার শুধু তাদেরকেই দেখে। আর আমাদের যাদের কিছুই নেই তাদের কথা সরকার শুনতেই পায় না। সরকারকে বলছি, আমাদের কথা একটু ভাবুন। আমরা যাতে বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।''

মধু পাড়তে যাবার জন্য যে 'মউলে কার্ড' আছে সে সম্পর্কেও আরতি সামন্তর বক্তব্য, ''যাদের বিএলসি কার্ড আছে তারাই মউলে কার্ড পায়। তাও সত্তর-আশি জনের বেশি নয়। ফলে মাছ কাঁকড়ার বদলে মধু পেড়েও যে সংসার চালাব তার উপায় নেই।'' মধু পাড়া আরও বেশি বিপজ্জনক, তবুও বেঁচে ফিরলে সংসারটা বাঁচে। না হলে-তো এমনিই মরবে।

এর মধ্যেই একটু আশার কথা শোনালেন শান্তিবালা নস্কর। স্বামী লখাই নস্কর মারা গিয়েছিলেন বাঘের আক্রমণে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০২৩ সালে কোর্টের রায়ে পাঁচলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এই লড়াইয়ে পাশে পেয়েছেন এপিডিআরকে। বললেন, ''এপিডিআর সঙ্গে না-থাকলে লড়াই জেতা-তো দূর; এই লড়াই করার সাহসই পেতাম না। আমিই প্রথম, যে এই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পেরেছি। আমার পরে আরও চারজন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এর মধ্যে তিনজনই এপিডিআর-এর সহযোগিতাতেই মামলা করেছে। এর আগে বলা হত যে, শুধু বিএলসি কার্ড যাদের আছে তারাই ক্ষতিপূরণ পাবে। ফলে কেউই আর ক্ষতিপূরণ পেত না। এখন কোর্টের অর্ডার হয়েছে বিএলসি থাকুক বা না-থাকুক বাঘের আক্রমণে মারা গেলেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মারা গেলে পাঁচ লক্ষ টাকা, আহত হলে এক থেকে তিন লক্ষ টাকা। আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে।''

''এপিডিআরকে পাশে পেয়ে আমরা লড়াই করার সাহস পেয়েছি। এপিডিআর আমাদের লড়াইয়ের সঙ্গে থেকেছে, সাহস যুগিয়েছে। সব থেকে বড় কথা সমস্ত রকম বিপদে আপদে আমরা এপিডিআরকে পাশে পাই। এখনও আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সরকার বলেছিল মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে। সে চাকরি এখনও পর্যন্ত কেউ পায়নি। এছাড়া আমাদের আরও অন্যান্য অনেক দাবি-দাওয়া রয়েছে। আমরা সুন্দরবনের মানুষরা এই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে প্রকৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকি। নদী জঙ্গল আমাদের প্রাণ। সেখান থেকে আমাদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবই। কোর এরিয়া বাড়িয়ে আমাদের উৎখাত করার চক্রান্ত আমরা মানব না।'' সাজেদা শেখের গলায় উদ্বেগের সুর, ''এখন শুনছি কোর এরিয়া বাড়ানো হয়েছে। আমরা বাফার এরিয়া ভেবে ঢুকে পড়লেই ওরা ধরে নিয়ে যায়। জরিমানা চায়। দিতে না-পারলেই জাল নৌকো সব কেড়ে রেখে দেয়। ঐ জাল নৌকোই-তো আমাদের সর্বস্ব। সে নিয়ে নিলে-তো আমরা না-খেতে পেয়েই মরে যাই। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের এই অত্যাচার থেকে বাঁচব কীভাবে?''

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের এতগুলো বছর পার হয়ে এখনও যে প্রশ্ন উচ্চারিত হয় ঐ প্রান্তে থাকা নারীদের মুখে; তা কী আমাদের প্রসাধন আর গয়নার ছাড়ের বিজ্ঞাপনগুলোকে লজ্জায় মুখ ঢেকে দেয় না? প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার দায় রয়েছে রাষ্ট্রের। ক্ষমতায় থাকা সরকারের। অনুষ্ঠান শেষে গ্রামের পথে পথে ঘুরে মিছিলে স্লোগানে পা মেলালেন, গলা মেলালেন সকলে। প্রশ্ন-দাবি আর প্রতিবাদের শব্দে জল, জঙ্গলের আনাচ কানাচ সেদিন চমকে উঠেছিল। কিন্তু রাষ্ট্র? সেকি একটুও ভাবছে এই মানুষগুলোর কথা? তার কি কোনও বিচলন হয়? সে বধির। তাই আরও আরও জোরে চিৎকার করতে হবে। শব্দগুলো যেন কান ফুঁড়ে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ওই তাবড় মাথাওয়ালাদের। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক কিশোরী গাইছিল— ''ও আমার দেশের মাটি''। যার পায়ের তলার মাটিটুকু নিরন্তর অনিশ্চয়তায় সরে সরে যাচ্ছে সে কি খুঁজে পাবে তার দেশের মাটিকে?

আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার

ডাঃ চন্দনা মিত্র

২০২৪ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের স্লোগান—'মাই হেলথ মাই রাইটস', অর্থাৎ 'আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার'। অনেকেই এ নিয়ে চর্চা করছেন। আমরাও একটু দেখি— স্বাস্থ্যে আমাদের কতটা অধিকার!

স্বাস্থ্য'র সংজ্ঞাঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্য মানে শুধু নীরোগ থাকা নয়, স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা। স্বাস্থ্য এমন একটি বিজ্ঞান ও শিক্ষা যা মানুষকে সুস্থভাবে দিন যাপন ও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই বেঁচে থাকাটা কিছু মানুষের জন্য নয়, সামাজিক ভাবে সব মানুষের এবং সমানভাবে হওয়া দরকার। যতই দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া হোক-না-কেন, জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিটি মানুষের সবচেয়ে উন্নত মানের স্বাস্থ্য উপভোগ করার মৌলিক অধিকার আছে।

যেখানে রোগ নেই, দুর্বলতাও নেই— স্বাস্থ্যের সেই শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, সুপেয় জল, বাসস্থান, পোষাক, দূষণ মুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা ও মানসিক চাপমুক্ত জীবন। অন্য দিকে, অর্থনৈতিক

শোষণ, বৈষম্য (লিঙ্গ-জাতি-গ্রাম-শহর ভেদে), অজ্ঞতা, হল খারাপ স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ।

খাদ্যের অধিকারঃ পৃথিবী ব্যাপী বহু অনাহার, দুর্ভিক্ষ-এর মুখে দাঁড়িয়ে মানুষের বেঁচে আর বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খাদ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও খাদ্য আন্দোলন করে খাদ্য সামগ্রীর জন বিতরণ ব্যবস্থা বা রেশন ব্যবস্থা আদায় করা হয়েছিল যা অবশ্য ক্রমান্বয়ে বহু অনিয়ম আর দুর্নীতির কবলে গিয়ে পড়েছে। ২০২৩ সালে নানা আন্তর্জাতিক চাপে আমাদের দেশে খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০২৩ তৈরি হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রচলিত রেশন ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ ও শহরের ৫০ শতাংশ মানুষকে কিছু খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করার কথা। শাসক দলের 'দাদা দিদি'রা নিজেদের নাম কেনার জন্য সেগুলিকে প্রচারে নিয়ে আসেন (নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া ব্যাগে ৫ কিলো আটা), কিন্তু বাস্তবে তা জনগণের করের টাকায়ই হয়ে থাকে।

কিন্তু শুধু চাল-আটা-তো পুরো খাদ্য সুরক্ষা দিতে পারে না। সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার। বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসও ভিন্ন ভিন্ন, তার ওপর ফতোয়া জারি করলে তা'তে খাদ্যের অধিকারের ওপর আঘাত হানা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল-এর মাধ্যমে শিশুদের এবং রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের জন্য যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা' পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সুরক্ষার ধারে কাছে পৌঁছয় না। ফলে আমাদের দেশের একটি বড় অংশের মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার। বিশ্বে ক্ষুধা সূচকে ১২৫ টি দেশের মধ্যে ১১১ তম স্থানে ভারত।

পরিষ্কার জলের অধিকারঃ আমরা তো সকলেই জানি জলের অপর নাম জীবন। স্বাস্থ্য রক্ষায় জলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই জল পেতে গুজরাট, রাজস্থানের মেয়েরা এখনও বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে দূরদূরান্ত থেকে মাথায় করে বয়ে আনেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাংলারও কিছু অঞ্চলে খাল বিল পুকুর কূঁয়ো শুকিয়ে জলের তীব্র অভাব দেখা দেয়। তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও মাটির নীচের জল অত্যধিক মাত্রায় তুলে নেওয়ার ফলে জলের সমস্যা এখন সর্বত্র। পেট্রোলের মতো জল ও কিনতে হচ্ছে। বড় বড় জলের কোম্পানি, পেপসি-কোকাকোলার কারখানায় গ্যালন গ্যালন ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে চলেছে অথচ দেশের বিরাট অংশের মানুষ সুপেয় জলের অধিকার থেকেই বঞ্চিত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জল নিয়েই হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ।

বাসস্থানের অধিকারঃ এদেশের বহু মানুষ গৃহহীন। বহু পরিবার ত্রিপলের তলায় বাস করেন। স্যাঁতসেঁতে আলো বাতাস হীন ঘরে বহু মানুষের বাস। যক্ষ্মা রোগ বা অন্যান্য সংক্রামক অসুখ হলে চাই আলো-বাতাস যুক্ত খোলামেলা ঘর। ইন্দিরা আবাস যোজনায় ইদানীং অনেক গরীব মানুষের মাথার অপর ছাদ জুটেছে। কিন্তু তা' অত্যন্ত অপরিসর, তাছাড়া তার নির্মাণ এত দুর্বল ও অস্বাস্থ্যকর যে পরিবারের সকলের বাসযোগ্য নয়।

নিরাপদ পোশাকের অধিকারঃ স্বাস্থ্যরক্ষায় পোশাকও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহু মানুষ আজও খোলা আকাশের নীচে সামান্য শীত বস্ত্রে রাত কাটান, কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। আবার আধুনিক শিল্প-সভ্যতার অবদান— পেট্রোলিয়ামজাত সিনথেটিক পোশাকের দরুন স্বাস্থ্যহানিও ঘটছে। একদিকে তুলো চাষের মন্দায় চাষিরা ঋণ গ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করছেন অন্য দিকে সুতি সুতোর অভাবে স্বাস্থ্যকর সুতির পোশাক দুর্লভ হয়ে গেছে বিশেষত নিম্নবিত্ত, গরীব মানুষের জীবনে, দামেও নাগালের বাইরে। ছোটো শিশুদেরও বাধ্য হয়ে সস্তার সিন্থেটিক জামাকাপড় পরান তাঁরা। মেয়েদের সিন্থেটিক কাপড় পরে উনুন তা'তে রান্না করতে হয়, সিনথেটিক কাপড়ের ইউনিফর্ম পরে বাচ্চারা স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। সিন্থেটিক কাপড় পরে শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে, ব্যাঘাত ঘটছে হজম, ঘুম ইত্যাদির। সিনথেটিক পোশাক থেকে চর্মরোগের শিকার হচ্ছে মানুষ। মজার ব্যাপার হল তুলোর ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের বরাবরই নজর, ইংরেজরা ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার তুলো নিয়ে যেত নিজেদের দেশের কাপড় কলে। এখন ইউরোপ আমেরিকার লোকরা নিজেরা সুতি কাপড় পরে আর সিনথেটিক পরায় তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষদের।

পরিবেশের অধিকারঃ সুস্বাস্থ্যের অন্যতম শর্তই হল সুস্থ পরিবেশ। প্রতিটি মানুষের সুস্থ পরিবেশে বাঁচার অধিকার রয়েছে। সাম্প্রতিক কোভিড থেকে আজকের তাপপ্রবাহ— আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্যে দূষিত পরিবেশের কী প্রভাব। অপরিকল্পিত ভাবে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা, বড় বড় নদী-বাঁধ তৈরী, জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়া— সবই স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এর পরেও আছে কল কারখানার ভিতরে শ্রমিকদের ওপর ধোঁয়া-ধুলো-উত্তাপ থেকে তাদের স্বাস্থ্যক্ষয় এবং কারখানার বর্জ্য থেকে গাছপালা-নদী নালা দূষণের প্রভাবে চারপাশের মানুষদের অসুস্থতা। গৃহশ্রম সহ অসংগঠিত প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের এমন পরিবেশে কাজ করতে হয় যা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর খুব খারাপ

প্রভাব ফেলে। কাঠ ও কয়লা জ্বালিয়ে রান্নার দূষণ থেকে দরিদ্র নারীদের রেহাই দিতে মোদী সরকার খুব প্রচার করে যে উজ্জ্বলা যোজনা শুরু করল, তার বিপুল দামের চোটে বহু মানুষ গ্যাস সিলিন্ডার আর তুলতেই পারে না। উচ্চবিত্তদের বিলাসিতা-তো ছিলই, জলবায়ুতে উষ্ণতা যত বাড়ছে মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাপ-নিয়ন্ত্রক এসি-র ব্যবহার তত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তার দরুন গরিবের কষ্ট বাড়িয়ে পারিপার্শ্বিক তাপও সমান হারে বাড়ছে।

শিক্ষাঃ শিক্ষা মানুষের জীবনে শুধু স্বাস্থ্যরক্ষায় নয়, বেঁচে থাকার অত্যাবশকীয় বিষয়। কী খাদ্যে কী পুষ্টি, কেমন ভাবে রান্না করলে তার পুষ্টিগুণ বজায় থাকবে, কী খাব, কতটা খেলে সুস্থ থাকব, কখন ডাক্তার দেখাতে হবে, কী ওষুধ খাব— এসব জানতে হলে প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম শিক্ষা দরকার। আর এই শিক্ষাও মানুষের মৌলিক অধিকার। আজও অনেক মানুষ লেখাপড়া জানেন না বলে হাসপাতাল ইত্যাদিতে প্রচুর হয়রানির শিকার হন। সুশিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাত্রা বা জীবনশৈলী গড়ে তোলাটাও স্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত।

সুস্থ জীবনযাত্রার অঙ্গ হল খেলাধুলা এবং জীবনমুখী সংস্কৃতি। কিন্তু এখন পাড়ায় পাড়ায়, স্কুল কলেজে খেলার মাঠ নেই, খেলা ও শরীরচর্চা হয় না বললেই হয়। তার পরিবর্তে যে কোনও আনন্দ-উৎসবে বা আড্ডার অনুষঙ্গ হিসেবে মদ আর মাদক সেবন এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান মদতদাতা এখন সরকারই, খাদ্য, সুপেয় জল দিতে পারছে না কিন্তু মদ খাইয়ে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করার দায়িত্ব সেধে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারঃ দিন আনা, দিন খাওয়া ব্যস্ততার জীবনে সমস্যার শেষ নেই। দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে বহু মানুষ অবসাদের শিকার হয়ে পড়ে। চোখের সামনে গাছপালা ধ্বংস করে ইমারত গড়ে উঠছে। কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বংসের মুখে। অধিক ফলনশীল চাষ আবাদ করতে গিয়ে সার, কীটনাশক ব্যবহারের দৌরাত্মে মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যহানি যেমন ঘটছে, মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করে ফসল মার খেলে অবসাদে আত্মহত্যার পথ নিচ্ছে অসংখ্য মানুষ। তরুণ প্রজন্মের দিশাহারা অবস্থা। লেখাপড়া শিখেও সম্মানজনক কাজ নেই। নতুন কোনও কলকারখানা গড়ে উঠছে না যেখান থেকে তারা রোজগার করবে। সর্বত্র চরম অনিশ্চয়তা। ফলত বেশী বেশী মানুষ অবসাদের, মানসিক অসুখের শিকার হয়ে পড়ছে। এই অসুস্থতার চিকিৎসা খুবই অপ্রতুল। শুধুমাত্র ঔষধে এ-চিকিৎসা হয় না। সুস্থ পরিবেশ দরকার। বর্তমানে মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার ছোটো থেকে বড়, সব মানুষের মধ্যে বহু ধরণের শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি অভূতপূর্ব জন বিচ্ছিন্নতা দেখা দিচ্ছে, যার পরিণাম একাকীত্ব, মানসিক অসুস্থতা।

বৈষম্যঃ আমাদের সমাজে নারী, পুরুষ, অন্য লিঙ্গের মধ্যে ভেদাভেদ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। খুব ছোটো থেকেই মেয়েরা এই আবহতেই বেড়ে ওঠে। পুষ্টি, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা সব কিছুতেই এই বৈষম্য দেখা যায়। ঘরে মেয়ের জন্মানোটাই অভিশাপ। কন্যাভ্রূণ হত্যা, নাবালিকা বিয়ে, মাতৃ মৃত্যু— এখনও ঘটে চলেছে। সংবিধানে সমান অধিকারের কথা বললেও কার্যত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য এখনও মেয়েদের রান্নাঘর, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, পরিবারের সকলের মনোরঞ্জনের যাঁতা কলেই পিষে চলেছে। বয়ঃসন্ধি, ঋতুচক্র, গর্ভধারণ-প্রসব ও ঋতুপর্য্যায় পর্যন্ত জীবনকালে অধিকাংশ মেয়ের ঠিকঠাক যত্ন নেওয়া হয় না। পরিপূর্ণ পুষ্টি, বিশ্রাম না-হওয়ায় দুর্বল শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। বৈষম্যের কারণে নিজেদের কষ্টকেও তারা গোপন করেন। শারীরিক, মানসিক অসুস্থতার শিকার হন। বহু পিতৃতান্ত্রিক পরিবার মেয়েদের চিকিৎসার জন্য খরচ করতেও পিছপা হন। অনেকে ঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাও পান না। প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেই পরিষেবা দিতে পারবে না, যত দিন-না এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়।

চিকিৎসার অধিকারঃ এর মানে কারোর দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা নয়। যে-কোনও মানুষ অসুস্থ হলেই তার উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে তবে বলা যায় অধিকার। তা কি আমাদের দেশে নিশ্চিত করা গেছে? চিকিৎসা মানে কিছু ওষুধ প্রয়োগ করা নয়। সাম্প্রতিককালে উচ্চরক্তচাপ, রক্তের সুগার নির্ণয় ও তার ওষুধ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো থেকে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতার কিছু কাজও এই কেন্দ্রগুলো থেকে হয়। কিন্তু কোনও মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হলে, দুর্ঘটনা ঘটলে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে তার ব্যবস্থা খুব দুর্বল ও অপর্য্যাপ্ত। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে সরাসরি রেফার করা যায় না। সেই হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই। ডাক্তার থাকলে যন্ত্রপাতি নেই, যন্ত্র থাকলে চালাবার লোক নেই বা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এরকম হাজার একটা সমস্যা, নিয়মের বেড়াজাল মানুষকে 'রাইটস' তথা অধিকারের ধারে কাছে আসতে দেয় না। বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার দায়বদ্ধতা জন সুরক্ষার

রক্ষকদের নেই। যতটুকু পয়সা ততটুকু অধিকার। একজন মানুষ পয়সা খরচ করে প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসা কিনতে যান, কিন্তু কড়ি দিয়েও যে সব সময় সুচিকিৎসা কেনা যায় না। আর তার মাত্রা এতটাই লাগামছাড়া যে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

কী করলে অধিকার পাওয়া যাবে ?

স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবেই স্বীকৃত। তাই বিনামূল্যে বা আর্থিক নাগালের মধ্যে চিকিৎসা প্রতিটি মানুষের অধিকার।

চিকিৎসা পরিকাঠামোয় বিগত ৭৬ বছরে উন্নয়ন হয়নি এমন নয়। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের জন্য নয়। যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তা মুলত পণ্যায়নের পরিকাঠামো। স্বাস্থ্য এখন মুনাফার জায়গা। প্রচুর পুঁজির অনুপ্রবেশ। বড় বড় কর্পোরেট হাসপাতাল। একদল পয়সাওলা মানুষ, যারা টাকা দিয়ে পরিষেবা কেনেন। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা ঠিক না-থাকায় মানুষ পরিষেবা পান না। জনসুরক্ষা সুরক্ষার দায়বদ্ধতা যাদের হাতে তারা মনেই করেন না প্রতিটি মানুষের বাঁচার সমান অধিকার আছে। আর এই সুস্থভাবে বাঁচা একক ভবে হয় না। আজ যদি কোনও গ্রামে বা বস্তিতে ডেঙ্গু হয়, ডেঙ্গুর মশা গোটা গ্রাম বা শহরে ছড়িয়ে যাবে যদি তাকে এলাকাগত ভাবে উচ্ছেদ না করা হয়। গরীব খেটে খাওয়া সুবল মুর্মু টি বি রোগে আক্রান্ত হলে পাশের বাড়ির মানমণির ঘরে ছড়িয়ে পড়বে যদি তাকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ না-করা হয়। কোভিডকালে বহু চিকিৎসককে আমরা হারিয়েছি রোগটির উৎস ঠিকভাবে না বোঝায়। এই অবস্থায় স্বাস্থ্য'র অধিকার পেতে মানুষকেই বুঝতে হবে তার অধিকার কী কী ? গড়ে তুলতে হবে অধিকার পাওয়ার আন্দোলন। মানুষ লড়াই করে ছিনিয়ে নিতে পারলে স্বাস্থ্যের অধিকার সুরক্ষিত হবে। নয়ত শ্লোগান হয়েই থেকে যাবে 'আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার'। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে—অধিকার কে কা'কে দেয়—

পৃথিবীর ইতিহাসে কবে কোন অধিকার
বিনা সংগ্রামে শুধু চেয়ে পাওয়া যায় ?
অধিকার কেড়ে নিতে হয়
অধিকার লড়ে নিতে হয়।

তথ্যানুসন্ধান

তথ্যানুসন্ধান— কৃষ্ণনগর শাখা, এপিডিআর

কাটোয়ার গীধগ্রামে নিম্নবর্ণ দাস সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়ায় আপত্তি গীধেশ্বর শিব মন্দির কমিটির।

সকালবেলার সংবাদপত্রে খবরটা দেখে চিনতে অসুবিধা হয় নিজের রাজ্য বাংলাকে। এতদিন যা হিন্দুত্ববাদের দাপটে থাকা রাজ্যগুলির পাশে কি জায়গা করছে পশ্চিমবঙ্গও ? প্রশ্নের উৎস যেখান থেকে— শিবরাত্রির দিন দাস সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের গীধেশ্বর শিব মন্দিরে ঢুকতে দিতে আপত্তি জানায় ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা। মন্দির কমিটির কাছে (ঘোষপাড়ার নিয়ন্ত্রণে) মন্দিরে ঢুকতে না-দেওয়ায় যথেষ্ট কারণ নাকি এটাই ছিল যে দাসপাড়ার বাসিন্দারা 'জাতে নীচু' !

ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে ৮ ই মার্চ, ২০২৫, এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে একটি টিম তথ্যানুসন্ধানে যায়। দাসপাড়ার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলতে বসে তথ্যানুসন্ধান টিমকে ঘিরে বসেন মহিলা, পুরুষ এমন-কী শিশুরাও। শিবরাত্রির দিন শিবের মাথায় জল দিতে না পারাকে কেন্দ্র করে যে ক্ষোভ, অমর্যাদা আর অসম্মানের শিকার হ'ন তারা একে একে সেই অবমাননার কথা বলতে থাকেন ।

স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত দাস জানান এই অবমাননা আজকের নয়, বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকেই 'অস্পৃশ্যতার গ্লানি' বয়ে নিয়ে চলতে হয়েছে তাদের। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করেছে কিন্তু তা রয়ে গেছে আমাদের রক্তে ! শিবরাত্রির দিনের অপমান সহ্য করতে না-পেরে তারা এসডিও, এসডিপিও সহ ডিএম-কে জানালে এসডিও উভয় পাড়ার বাসিন্দাদের আলোচনায় ডাকেন। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর সেই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, গীধগ্রামের গীধেশ্বর শিব মন্দিরে ঐ গ্রামের দাস পরিবারের সকলে মন্দিরে প্রবেশ করে ভগবানকে পূজা দিতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রেখে ৭ ই মার্চ, '২৫ দাস পাড়ার চারজন মহিলা দীর্ঘদিনের গ্লানি সরিয়ে গীধেশ্বর শিব মন্দিরে পূজো দিতে যান। কিন্তু তারা যাওয়ার সাথে-সাথেই মন্দিরে তালা লাগিয়ে দেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। পাশাপাশি বাস দুই পাড়ার। দ্বিতীয়বার অবমাননাকর এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উভয় পাড়ার মানুষ জড়ো হলে দেখা যায়, ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সহ মন্দির কমিটির সদস্যরা নানা অজুহাতে আসলে মন্দিরে ঢুকতে দিতে নারাজ! দাস পাড়ার বাসিন্দা পূজো দিতে আসা লক্ষ্মী দাস

জানান, দুই পাড়ার লোকেদের মধ্যে ঘোষপাড়ার লোকেরা লাঠি নিয়ে তাড়া করেন তাদের, শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। এমন-কী তাদের উদ্দেশ্যে একথাও বলা হয়, 'দাসেরা পূজো দিতে এলে মন্দিরের সাথে তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে!'

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে ঘোষপাড়া দাসপাড়ার চাইতে একটু 'এগিয়ে' আছে। এই কারণেই পাশাপাশি বাস করেও দাস সম্প্রদায়ের উপরও ঘোষেরা আধিপত্যকারী শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। মন্দিরে পূজো দিতে না-পারার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা আসলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই আধিপত্যের বিরুদ্ধেও এক প্রতিবাদ হিসেবে সামনে আসে। দাস সম্প্রদায়ের মানুষের কথায়, ভঙ্গিমায় সেই ছবিটাই স্পষ্ট হয় তথ্যানুসন্ধান টিমের কাছে। অর্থনৈতিক ভাবে, শিক্ষাগত ও সামাজিক ভাবে পশ্চাদপদ দাস সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ভাবে ঘোষ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার সুযোগকে ব্যবহার করে ঘোষেরা চাষের জমিতে চাষ করতে দাসেদের নামতে দেয় না। বন্ধ করে দেয় দাসপাড়ার গোয়ালার থেকে দুধ নেওয়া। সাধারণভাবে দুই পাড়ার মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' থাকলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু 'জাতে নয় ভাতে মারার'ও চেষ্টা শুরু হয়।

এরপর তথ্যানুসন্ধান টিম ঘোষপাড়ার বাসিন্দা ও মন্দির কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলেন। বেশ কিছু পুরুষ এগিয়ে আসেন কিন্তু কথা বলতে অনাগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। 'মন্দির সকলের, তাই সেখানে সবাইকেই ঢুকতে দেওয়া উচিত!' এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে ঠিক এই ভাষ্যে কথা শুরু হতেই ঢুকতে না-দেওয়ার স্বপক্ষে আমাদের সামনে তারা যে যে যুক্তি হাজির করেন— ১) মন্দির তৈরী করতে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে, দাসেরা আগে পয়সা দিক তারপর ঢুকবে ২) আমরা পাঁচ হাজার আর ওরা দু'হাজার লোক। আমরা কেন ওদের এমন আব্দার শুনবো যা এতদিন কেউ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি? ৩) মন্দিরের পুরোহিতরা বলেছেন, দাসেরা মন্দিরে ঢুকলে তারা আর পূজো করবেন না ৪) সংবিধানে যাই থাক, যা এতকাল হয়নি, তা এখন হতে পারে না।

আমাদের মনে হয়েছে, উপরের সব ক'টি যুক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির দম্ভ রয়েছে তা স্পষ্ট। স্পষ্ট এটাও যে, প্রশাসনিক এবং সামাজিক চাপে দাসেদের মন্দিরে ঢুকতে দিতে বাধ্য হলেও, জাতপাতের যে মোটা দাগের বিভাজন রেখা আছে তা ঘোষেদের মন থেকে সহজে মুছবার নয়। তথ্যানুসন্ধান টিমের পক্ষ থেকে তাদের যুক্তিগুলির অন্তসারশূন্যতা বোঝানোর চেষ্টা করা হলে ও তা মন থেকে মেনে নিতে নারাজ তারা। উপরন্তু, দাসেদের মন্দিরে ঢোকা তাদের কাছে পরাজয়ের সমান।

এসডিও'র সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে উনি জানান, সেদিন উনি পারছেন না। তাই কাটোয়া থানায় আই সি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এলাকার শান্তি বজায় রেখে দাসেদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারকে বহাল রাখার দাবিতে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আই সি জানান, দীর্ঘদিনের চলে আসা রীতি একবারে সবটা ভাঙা সম্ভব নয়, তবে আসতে আসতে ভাঙার চেষ্টা করতে হবে। উনি জানান, প্রশাসন উদ্যোগ নিচ্ছে, মন্দিরে সকলের পূজো দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে উভয় পাড়ার মানুষের সম্মতিতে দাস সম্প্রদায়ের মানুষকে মন্দিরে প্রবেশ করাতে।

পর্য্যবেক্ষণ

১) ধর্ম্ম, জাতপাত, বর্ণভেদ আজও আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় বহাল রয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত ধর্ম্মাচারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি আজও। গীধগ্রামের ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত।

২) উচ্চবর্ণের মানুষ ধর্ম্মান্ধতা, কুসংস্কার জিইয়ে রেখেছে নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর নিজেদের আর্থ-সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখতে। এই ঘটনায় ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষ সেই আধিপত্যকারী ভূমিকায় থেকেছে। অন্যদিকে, বর্ণ ও জাত বিভাজিত সমাজে উচ্চবর্ণের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণের সহজাত ক্ষোভ থেকেই দাস সম্প্রদায়ের মানুষ তিন শতকের বস্তা পচা রীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।

৩) প্রশ্ন উঠেছে, দাসেরা নিজেরা একটা মন্দির বানিয়ে পূজো করছে-না কেন? কেন গীধেশ্বর শিব মন্দিরেই তাদের পূজো দিতে আসতে হবে? এপিডিআর মনে করে, নিম্ন বর্ণ ও উচ্চ বর্ণের জন্য আলাদা আলাদা মন্দির তৈরী করলে ধর্ম্মাচারণের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। বরং তা বর্ণবাদ, জাতপাতকেই টিকিয়ে রাখে একই সমাজের পৃথক পৃথক খোপে। দাস সম্প্রদায়ের এই লড়াই আসলে জাত ও বর্ণ বিভাজনের বিরুদ্ধে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হিসেবেই সামনে উঠে এসেছে। এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধান টিম নিম্নবর্ণের এই লড়াই-এর প্রতি তাই সমর্থন ও সংহতি জানাচ্ছে।

৪) প্রশাসন এক্ষেত্রে আপাতভাবে উদ্যোগী হয়েছে দাস সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। কিন্তু, উচ্চবর্ণের ঘোষ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সক্রিয়তা তথ্যানুসন্ধান টিমের চোখে পড়েনি।

৫) দাসপাড়া লোকেদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমূল কোম্পানিতে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং জমিতে কাজ করতে না-দেওয়ার যে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে প্রশাসন যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি।

৬) সমস্ত এলাকা থমথমে হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

তথ্যানুসন্ধান টিমে ছিলেন— প্রভাত সিংহ রায়, জয়শ্রী পাল, চৈতালী দাস, মৌতুলি নাগ সরকার ও রঞ্জিত (কালনা সমুদ্রগড় শাখা)

তথ্যানুসন্ধান--- মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি, এপিডিআর

১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায়, আসাম পুলিশ মুর্শিদাবাদ হরিহরপাড়ার আব্বাস আলি এবং মিনারুল হক-কে বাংলাদেশী জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত এবং জঙ্গি সন্দেহে গ্রপ্তার করে। আরও জানা যায়, আব্বাস আলী এবং মিনারুল হক-কে পশ্চিমবঙ্গের কোনও থানায় না-নিয়ে সরাসরি আসামে নিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষিতে গত ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪, এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির একটি টিম হরিহরপাড়ায় তথ্যানুসন্ধানে যায়। তারা প্রথমে মোঃ আব্বাস আলীর বাড়ি যায়। আব্বাসের ঘর হরিহরপাড়ার নিশ্চিন্তপুরে। ইঁট বের করা একটি অসমাপ্ত বাড়ি হল আব্বাসের। আব্বাসের বাড়ি ছিল একদম ফাঁকা। ঘরে কেউ ছিল না। প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্তভাবে জানান, বাড়িতে কেউ নাই। আব্বাসের মা মেয়ের বাড়ি গিয়েছে। আব্বাসের বউ বাচ্চাকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছে। তারা আরও জানান, আব্বাস হাফিজ ছিল। বাচ্চাদের কোরান মুখস্ত করাতো। মা, বউ ও একটি চার বছরের বাচ্চা, এই হল আব্বাসের পরিবার। আব্বাসের পিতা এরশাদ মন্ডল বর্তমানে মৃত। উনি একজন মৌলবি ছিলেন। পেশায় তাঁর কাপড়ের ব্যবসা ছিল। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে একজন আব্বাস। আব্বাসের দুই বোন রোকিয়া বিবি ও জৈনব বিবি। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে নিশ্চিন্তপুরের নিকটস্থ বনপাড়া বড় দীঘির পাড়ে।

প্রতিবেশীরা বলেন, আব্বাসের ঘরে খুব বেশী বাইরের লোক আসতো না। ওদের আত্মীয়-স্বজনরাই আসত। এলাকার সবাই আব্বাসকে চিনত। কোনও ঝুট-ঝামেলা করতে আব্বাসকে কেউ দেখেনি। শান্ত স্বভাবের লোক ছিল। রাত্রে যখন আব্বাসকে অ্যারেস্ট করা হয়, তখন পুলিশ কয়েকজন প্রতিবেশীকে জানায়। আব্বাস বাংলাদেশী জঙ্গি শুনে তাঁরা অবাক হয়ে যান। বিষয়টা বিশ্বাস হয় না। আব্বাসের ঘরের পাশের একজন ৭১ বছর বয়সের জ্বালানি-কাঠ ব্যবসায়ী জানান, তিনি আব্বাস ও আব্বাসের বাবাকে অনেক আগে থেকে চেনেন। তিনিও পুরো বিষয়টা শুনে অবাক হয়ে যান। বিশ্বাস করতে পারেন না। কাছের লোকাল হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও জানান আব্বাস তার ডাক্তারখানায় ওষুধ নিতে আসতো। কোনও খারাপ কিছু তিনি কোনদিন দেখেননি।

এরপর এপিডিআর এর টিম বনপাড়া বড় দীঘির কাছে আব্বাসের বোনের বাড়িতে যায়। সেখানে আব্বাসের মা ওম্মে হাবিবা ছিলেন। তিনি জানান, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, রাত্রি দু'টোর সময় আব্বাসের নিশ্চিন্তপুরের বাড়িতে অনেক পুলিশ আসে। তারা আব্বাসের নাম ধরে চিৎকার করলে দরজা খুলে দেওয়া হয়। তার ঘরে ঢুকে আব্বাসকে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আব্বাসের ঘর থেকে পুলিশ দু'টি মোবাইল, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ও কোরান সহ আব্বাসের পড়ানোর কিছু বই যেমন 'নূরাণী কায়দা' সঙ্গে করে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, 'নূরাণী কায়দা' হল একটি মৌলিক আরবি পাঠ যা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে নতুনদের কোরান পড়ার মূল বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করে। বিভিন্ন মিডিয়া এই 'নূরাণী কায়দা' শেখার বইকেই আল কায়দা বলে চিহ্নিত করে।

পরের দিন সকালে আব্বাসের বোন জৈনব বিবি হরিহরপাড়া থানায় গেলে তাকে দু'টি কাগজ দেওয়া হয় ও বলা হয়, আব্বাসকে বাংলাদেশি জঙ্গির সাথে যুক্ত সন্দেহে আসাম পুলিশ নিয়ে গিয়েছে। এছাড়া আব্বাসের সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এপিডিআর কাগজগুলি দেখে বুঝতে পারে, আব্বাসের নাম ঠিকানা সমেত ইউএপিএ সহ ভারতীয় ন্যায়সংহিতার বিভিন্ন ধারা দিয়ে আসাম STF এর ডেপুটি এসপি সত্যেন্দ্র সিং হাজারি'র সই করা একটি অ্যারেস্ট মেমো। অপর কাগজটি হল সিজার লিষ্ট। আব্বাসের দুই বোন রোকিয়া ও জৈনব বিবি জানান, বহুদিন আগে আরবে কাজ করতে যাবে বলে আব্বাস পাসপোর্ট তৈরী করে। কিন্তু পুলিশ পাসপোর্ট নিয়ে যায়নি। তারা জানান, আব্বাস কোনদিন দেশের বাইরে যায়নি। আব্বাসের সাথে বাংলাদেশের কারুর কোনও পরিচয় কোনদিন ছিল না। তারা বলেন আব্বাসকে ফাঁসানো হয়েছে। আব্বাসের বোন রোকিয়ার স্বামী শাহাবুদ্দিন জানান, আব্বাসকে ছোট থেকেই সে চেনে। আব্বাস দশম শ্রেণী পর্যন্ত

সরকারি স্কুলে পড়েছে। ওর শখ ছিল হাফিজ হবে। তাই আর সরকারি স্কুলে না-পড়ে, কোরান পড়ে হাফিজ হয়।

আব্বাস এরপর কয়েকটা মাদ্রাসায় কাজ করার পর নিজেই কতগুলি বাচ্চাকে নিয়ে কোরান মুখস্থ করানো অর্থাৎ হিবস্ শেখাতে শুরু করে। বারুইপাড়া হাটের কাছে একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে কিছু বাচ্চাকে কোরান মুখস্থ করানো শুরু করে। আব্বাসের বড় ভাই আবু তাহের হিমাচল প্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ছোট ভাই ইউসুফ আলী চন্ডিগড়ে লেবারের কাজ করে। ছোট ভাই ইউসুফ কয়েকদিন আগে বাড়ি এসেছে। সে জানায়, আব্বাস যে বাড়িতে থাকতো সেটাও আব্বাসের একার নয়। তিন ভাইয়ের। ওই অসমাপ্ত বাড়িটা তিন ভাই মিলে করেছে। পঞ্চায়েতের আবাস যোজনার কোনও টাকা তারা পায়নি। কোনও চাষ করার আলাদা জমি তাদের নেই। সেও জানায়, আব্বাস নির্দোষ।

এপিডিআর-এর দল এরপর বারুইপাড়া হাটের কাছে আব্বাসের পড়ানোর জায়গায় যায়। সেখানে পড়ানোর জন্য আব্বাসের ভাড়া করা বাড়ির মালিক লালটু শেখের সাথে দেখা হয়। উনি জানান, আব্বাস ২৫,০০০ টাকার বিনিময়ে এক বছরের জন্য এই ছোট অসমাপ্ত বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু এক বছর পরও আব্বাস পুরো বাড়ি ভাড়া শোধ করতে পারেনি। ২০,০০০ টাকা শোধ করেছিল। ইলেকট্রিক বিলও শোধ করতে পারেনি। প্রথমে আব্বাস প্রায় বারোটা ছেলেকে নিয়ে পড়ানো শুরু করেছিল। এটা কোনভাবেই মাদ্রাসা নয়। কোরান মুখস্থ করা খুব কঠিন কাজ। তাই বেশিরভাগ বাচ্চা এই কাজটা সহজে পারে না। তাই বারোটা বাচ্চার জায়গায় এখন তিনটে বাচ্চা আব্বাসের কাছে পড়তো। এই বাচ্চাগুলো নিজেদের বাড়িতেও থাকতো, আবার মাঝে মাঝে এই ভাড়া বাড়িতে থাকতো। ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় আব্বাস বাড়ি থেকে খাবার এনে বাচ্চাগুলোকে দিত। এটাকে মাদ্রাসা না বলে প্রাইভেট টিউশন বলা ভালো। এর আগে আব্বাস সোলুয়া গ্রামের মাদ্রাসায় কাজ করত। মিডিয়াতে যে-মাদ্রাসার ছবি দেখানো হচ্ছে সেটা সোলুয়া মাদ্রাসার।

তথ্যানুসন্ধানী দল এরপর হরিহর পাড়ার রুকুনপুরে মাগুরা গ্রামে ৪০ বছর বয়সের মিনারুল শেখ'র বাড়ি যায়। এই বাড়িটিও অসমাপ্ত। মিনারুল শেখের পিতা ইমাজুদ্দিন শেখ অসুস্থ। মা আসমা বিবি ঘরের কাজ, রান্না সবকিছুই করেন। মিনারুলের বৌ টগোরা বিবি বলেন, ১৮ ই ডিসেম্বর ২০২৪ রাত্রি তিনটের পর পুলিশ নিজেই গ্রিলের গেট দিয়ে ঢুকে সরাসরি মিনারুলের ঘরে চলে আসে। তখন মিনারুল ও টগোরা ঘুমোচ্ছিল। ঘরের মধ্যে মহিলা পুলিশের সাথে পুরুষ পুলিশও ঢুকে যায়। মিনারুলকে ধরতে চার গাড়ি পুলিশ এসেছিল। পুলিশ যাওয়ার সময় ঘর থেকে দু'টো মোবাইল, মোবাইলে লাগানো একটা চিপ, মিনারুলের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ, 'নূরাণী কায়দা' শেখার বই ও টগোরা বিবির পাস বই নিয়ে যায়। মিনারুল ও টগোরা বিবির দুই ছেলে। কামরুল শেখ ও মানোয়ার শেখ। কামরুল রুকুনপুর স্কুল থেকে এবার মাধ্যমিক দেবে। মানোয়ার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। মিনারুল এলাকায় সেচ পাম্প সারাতো। সে কোনদিন বাইরের রাজ্যে যায়নি। জমি জায়গা তার কিছুই ছিল না। পঞ্চায়েতের দেওয়া ঘরের টাকায় তার এই অসমাপ্ত বাড়ি। টগোরা বিবি জানান, ব্যাঙ্কের যে-পাস বই পুলিশ নিয়ে গিয়েছে, সেই অ্যাকাউন্টে ঘরের টাকা, লক্ষীর ভান্ডারের টাকা, ছেলের স্কুল থেকে দেওয়া টাকা ঢুকেছিল। সব টাকা তুলে নেওয়ার পর আড়াইশো টাকা মত পড়ে আছে। মিনারুলের ভাই শামসুর শেখ, পেশায় রাজমিস্ত্রি। তিনি জানান, মিনারুল তার ছোট ছেলে মানোয়ারকে আব্বাসের কাছে কোরান মুখস্ত করার জন্য ভর্ত্তি করেছিল। মিনারুল মাঝে মাঝে ঘর থেকে খাওয়ার নিয়ে ছেলের কাছে যেত। ছেলেকে খাওয়াতো। কিছুক্ষণ থাকতো, তারপর চলে আসত। মিনারুল খুব অসুস্থ ছিল। তাঁর মাথার সমস্যা ছিল। তার জন্য চিকিৎসাও চলছিল। মিনারুলকে রাতে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাওয়ার পরের দিন সকালে বাড়ির লোক হরিহরপাড়া থানায় যায়। থানা থেকে দু'টো কাগজ দেওয়া হয়। অ্যারেস্ট মেমো ও সিজার লিষ্ট। এখানেও আসাম এসটিএফ ডেপুটি এসপি'র সই। থানা পরিবারকে জানায় মিনারুলকেও আসাম পুলিশ নিয়ে গিয়েছে।

উপরিউক্ত দু'টি ঘটনা থেকে নিম্নলিখিত পর্য্যবেক্ষণগুলি উঠে আসে—

১. আব্বাস আলী ও মিনারুল হক বাংলাদেশের কোনও জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত বলে এলাকার মানুষ বিশ্বাস করছে না।

২. আসামের ষ্টেট টাস্ক ফোর্স (STF), লোকাল কোর্টে না তুলে কী করে দু'জনকে আসাম নিয়ে যেতে পারে! এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে লঙ্ঘন করা। আসামের পুলিশ সম্পূর্ণভাবে এনআইএ-এর মত কাজ করছে। তাই এই অ্যারেষ্ট আইন সঙ্গত নয়।

৩. দু'জনকেই পাসপোর্ট অ্যাক্ট দেওয়া হয়েছে। আব্বাসের পাসপোর্ট পুলিশ নিয়েই যায়নি। তাহলে আব্বাসকে পাসপোর্ট অ্যাক্ট কিভাবে দেওয়া হল? আব্বাসের পাসপোর্ট যে জাল

সেটা কোথায় দেখা হলো? মিনারুল পড়াশোনা জানে না। তার কোনও পাসপোর্ট ছিল না। অথচ তাকেও পাসপোর্ট অ্যাক্ট দেওয়া হলো! কী-ভাবে দেওয়া হলো?

৪. আব্বাস বা মিনারুলের কাছ থেকে পাওয়া গেছে এমন কোনও অস্ত্র সিজার লিস্টে নেই। এলাকার কেউ কখনো তাদের কোনও জঙ্গি কাজকর্ম করতে দেখেনি। মিনারুলের এলাকায় কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই। তাহলে কী-করে জঙ্গি সন্দেহে তাদেরকে ইউএপিএ দেওয়া হলো।

৫. তাদেরকে অ্যারেস্ট করার বিষয়ে হয়তো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের হাত ছিল।

৬. বিভিন্ন প্রথম সারির মিডিয়ায় আব্বাসের পড়ানোর ছোট ঘরটিকে মাদ্রাসা বলা হচ্ছে। নিকটবর্তী সোলুয়ার মাদ্রাসাকে দেখিয়ে আব্বাসের মাদ্রাসার কথা বলা হচ্ছে। মাত্র তিন জন বাচ্চা ছেলে আব্বাসের কাছে পড়তো। অথচ বলা হচ্ছে আব্বাস মাদ্রাসার অনেক ছেলেকে জঙ্গি রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছে। এই মিথ্যা খবর ছড়িয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসাকে বাংলাদেশী জঙ্গি কাজকর্মের কারখানা বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে। এটা মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির ওপর এক বড় আঘাত। আরবি শেখার মৌলিক পাঠ 'নূরাণী কায়দা'কে আল কায়দা বলে বেশ কিছু মিডিয়া মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। জেলা ও রাজ্যজুড়ে এক সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ ও ইসলামোফোবিয়া তৈরি করা হচ্ছে। মুসলিম বিরোধী এক গণহিষ্টিরিয়া তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে।

তথ্যানুসন্ধানের পর গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪, বহরমপুরের সাংবাদিক সঙ্ঘে অভিযুক্ত আব্বাস আলী, মিনারুল হকের পরিবার ও সোলুয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথে নিয়ে এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলন করে রাষ্ট্রীয় জঙ্গি ন্যারেটিভের বিপরীতে সত্য ঘটনা সকলের সামনে নিয়ে আসে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। এর ফলে, রাষ্ট্র ও বড় বড় মিডিয়া হাউসের তৈরী করা 'জঙ্গি' ন্যারেটিভের বিপরীতে প্রকৃত ঘটনা জনগণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

২০ শে জানুয়ারি ২০২৫, রাজ্যের মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারপার্সনকে এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে আব্বাস ও মিনারুলের পরিবারকে সঙ্গে করে নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনের ফলে মাইনরিটি চেয়ারপার্সন মুর্শিদাবাদের এসপিকে তদন্ত করে সমস্ত রিপোর্ট কমিশনে পেশ করতে বলে। এই ডেপুটেশনের পর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে সমস্ত বিষয়গুলিকে ঘিরে একটি প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আব্বাস ও মিনারুলের পরিবারও বক্তব্য রাখে।

এর ফলে গোটা রাজ্যে রাষ্ট্র ও গদি মিডিয়ার তৈরী করা জঙ্গি ন্যারেটিভের বিপরীতে সত্য ঘটনা এক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। বেঙ্গল এসটিএফ বহরমপুরের জর্জ কোর্টের কাছে আব্বাস ও মিনারুলকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। কোর্ট আসাম এসটিএফ'কে গত ৬ ই ফেব্রুয়ারির, '২৫-এর মধ্যে আব্বাস ও মিনারুলকে বহরমপুর কোর্টে উপস্থিত করার অর্ডার দেয়। এরপর ৬ই ফেব্রুয়ারি কোর্টের অর্ডার মোতাবেক ৭ দিনের জন্য বেঙ্গল এসটিএফ আব্বাস ও মিনারুলকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এর সাত দিন পর আব্বাস ও মিনারুলকে কোর্ট জেল হেফাজত দেয়। তারা এখন বহরমপুর জেল হেফাজতে আছে। আব্বাস ও মিনারুলের পরিবার এখন প্রতি সপ্তাহে বহরমপুর জেলে তাদের সাথে দেখা করতে পারছে।

আমাদের দাবি

১. অবিলম্বে বাংলাদেশী জঙ্গি নামে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো লঙ্ঘনকারী এই ধরণের বেআইনি গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

২. আব্বাস ও মিনারুলকে ইউএপিএ এবং পাসপোর্ট অ্যাক্ট দেওয়া হল কেন? রাজ্য এবং আসাম পুলিশকে অবিলম্বে তদন্ত করে সত্য ঘটনা সামনে আনতে হবে।

৩. মিথ্যে খবর পরিবেশন করে জেলা ও রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। মুসলিম বিরোধী গণহিস্টিরিয়া তৈরী করার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত মানুষকেই জেলা ও রাজ্যজুড়ে ইসলামোফোবিয়া তৈরী করার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. আব্বাস ও মিনারুল এই রাজ্যের নাগরিক। তাদের পরিবারও এই রাজ্যের নাগরিক। তাদের আর্থিক অবস্থা আসামে গিয়ে কেস চালানোর মতো মোটেই নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে আব্বাস ও মিনারুলের পরিবারকে উকিলের খরচ, কেস চালানোর খরচ ও হরিহরপাড়া থেকে আসাম পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ অবিলম্বে দিতে হবে।

৫. পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আব্বাস ও মিনারুলের কেস বহরমপুরের জজকোর্টে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রিপোর্ট

রিপোর্টঃ বহরমপুর শাখা

যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চাপা দিয়ে ছাত্র খুনের চেষ্টার বিরুদ্ধে বহরমপুর শাখার প্রতিবাদ সভা

৬ ই মার্চ ২০২৫, বিকেল ৫'টায় টেক্সটাইল কলেজের মোড়ে বহরমপুর শাখা কলেজের ছাত্র ও শহরের নাগরিকদের নিয়ে নিম্নলিখিত দাবিগুলোর ভিত্তিতে এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করে। ডোমকল ও কান্দি শাখার সদস্যরাও এই সভায় অংশগ্রহণ করে।

দাবিগুলি ছিল—

১) যাদবপুরে গাড়ীচাপা দিয়ে ছাত্র খুনের চেষ্টার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার।

২) ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে সাজানো FIR প্রত্যাহার।

৩) মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার মহম্মদ সাহিলের নিঃশর্ত মুক্তি।

৪) ছত্তিশগড়ে গণহত্যার নীল-নকশা অপারেশন 'কাগার' বন্ধ।

৫) সাজানো মামলায় গ্রেফতার এসডিপিআই সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এম.কে.ফৈজির মুক্তি।

সভার সঞ্চালনা করে বহরমপুর শাখা সম্পাদক টুম্পা ঝাঁ। সভার প্রথমেই গণ সংগীত করেন শহরের সমাজকর্মী দেবারতি চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন PSU ছাত্র সংগঠনের জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ, AIDSO ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি সুরজিৎ দাস, বক্তব্য ও গণ সংগীতের মাধ্যেমে লড়াইয়ের আহ্বান জানান সমাজকর্মী ও সাংবাদিক সুমন সরকার , বক্তব্য রাখেন RSF ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে আবদুল্লা, APDR এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আবদুল গণি, বক্তব্য রাখেন সমাজ কর্মী মিজানুর রহমান ও আলি আকবর সিদ্দিকী এবং সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন APDR এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী।

রিপোর্ট ঃ কৃষ্ণনগর শাখা

১) ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালনে পথসভা ।

২) ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, পোষ্টার লাগানো হয়। বিষয় ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থার বিরুদ্ধে ও সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা পুনর্বহালের দাবিতে এপিডিআর, কৃষ্ণনগর শাখার পোষ্টার লাগানো হয় ।

৩) ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ জলঙ্গীর বিসর্জন ঘাট সংলগ্ন ২৫ নং ওয়ার্ডে বেআইনিভাবে মাটি কাটা বন্ধ হলেও মাটি কাটার ফলে তৈরি হওয়া গর্তগুলি পূরণ করার দাবিতে ইরিগেশন বিভাগে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

৪) ১১ ই জানুয়ারী ২০২৫ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় এপিডিআর-কে ষ্টল না-দেওয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর সদরের মোড়ে প্রতিবাদ সভা। এই ঘটনার প্রতিবাদে আওয়াজ তুলতে বুদ্ধিজীবীদের সই সংগ্রহ কর্ম্মসূচী চলে ।

৫) ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ নদীয়া জেলার সরকারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবাকে জনস্বাস্থ্যমুলক করার দাবিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়— ক) সরকারী হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ, ভ্যাকসিন রাখতে হবে।খ) ডিউটিরত চিকিৎসকদের নামের তালিকা জনসমক্ষে রাখতে হবে। গ) রোগীর পরিজনদের সাথে অন্তত দিনে দুই বার চিকিৎসকদের বাধ্যতামুলক দেখা করতে হবে। ঘ) হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগে অভিযোগ বিভাগ চালু করতে হবে এবং তা নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণে রাখতে হবে। ঙ) হাসপাতাল থেকে রোগীকে অন্যত্র বদলি করার আগে সেই হাসপাতালে বেড নিশ্চিত করতে হবে। চ) শান্তিপুর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক অবিলম্বে চালু করতে হবে। ছ) হাসপাতালের চিকিৎসকদের জেনেরিক নামে ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে।

এছাড়া শান্তিপুর হাসপাতালে সুপার দ্বারা মহিলা চিকিৎসকের হেনস্থার বিষয়ে ঐ দিন ই তথ্যানুসন্ধান করা হয় ।

৬ মার্চ ২০২৫, বার্ণিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশন ও রিপোর্ট ঃ

প্রতি
স্বাস্থ্য অধ্যক্ষ, বার্ণিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
পলাশীপাড়া, তেহট্ট ২, নদীয়া

বিষয়: বার্ণিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা বহাল রাখার দাবিতে স্মারকলিপি

মহাশয়,

বার্ণিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বার্ণিয়ার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, আপনি নিশ্চই এই বিষয়ে অবগত আছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপলব্ধ থাকা ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বার্নিয়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সকাল দশটা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত খোলা থাকার (শুধু বর্হির্বিভাগ) কারণে যে-কোনও রকম আপৎকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে বার্নিয়ার মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার কোনও সুযোগ থাকে না। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিরিশ শয্যা বিশিষ্ট যে-চিকিৎসা পরিকাঠামো থাকা দরকার, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তারও সুযোগ নেই। পূর্বে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু থাকলেও বর্তমানে তা নেই। উপর্য্যপরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বর্হির্বিভাগে দেখাতে আসা রোগীদের কার্য্যত, চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসাও অমিল। বর্হির্বিভাগে আসা রোগীদের শারীরিক অসুস্থতা কথা শুনে কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হয়, চিকিৎসকের থেকে কোনও প্রেসক্রিপশন বা কাগজের স্লিপ ছাড়াই। অনেক সময় ওষুধ খাওয়ার পদ্ধতিটুকুও বলে দেওয়া হয় না।

আপনি নিশ্চই অবগত আছেন, এইভাবে ওষুধ দেওয়া আইন বহির্ভূত, যা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। বার্নিয়ার সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার প্রত্যাশায় আসেন, শুধুমাত্র ওষুধ নিতে নয়— এই বিষয়টি আপনার নজরে আনার গুরুত্ব দাবি করে। পাশাপাশি, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে দুই দিন (সোম ও শুক্র) চিকিৎসক থাকেন (সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো)। বার্নিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনেই বার্নিয়া হাইস্কুল আছে। এই স্কুলের পড়ুয়াদের আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, গ্রামবাসীদের জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পাওয়ার কোনও অবকাশ থাকে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে বার্নিয়ার সাধারণ গ্রামবাসীদের জন্য একটি সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের অধিকার। তাই, এই স্মারকলিপির মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার দাবিতে আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি যে, অবিলম্বে বার্নিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সকল রকম চিকিৎসা পরিষেবা বহাল রাখতে আপনি উদ্যোগ নেবেন।

আমাদের দাবি

বার্নিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

১) ২৪×৭ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে।

২) অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে হবে।

৩) বর্হির্বিভাগে কোনও অবস্থাতেই কাগজের স্লিপ ছাড়া ওষুধ দেওয়া যাবে না। বর্হির্বিভাগে দেখাতে আসা রোগীদের শুধু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার দায় মেটানো নয়, চিকিৎসককে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

৪) রোগী ভর্তির ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আশা করি উপরোক্ত দাবিগুলি পূরণ করতে আপনি শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইতি।

ধন্যবাদান্তে,
তাপস চক্রবর্তী (এপিডিআর)
দিলীপ মজুমদার (এ আই সি সি টি ইউ)
মৌতুলি নাগ সরকার (এপিডিআর)
চায়না (এ আই সি সি টি ইউ)
আতিয়ুর রহমান (সংগ্রামী কৃষক মঞ্চ)
সুশীল ঠাকুর (সংগ্রামী শ্রমিক মঞ্চ)
তারিখ, ০৬-০৩-২০২৫

ডেপুটেশন রিপোর্ট ঃ বার্নিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একমাত্র চিকিৎসক ডঃ সুখেন দাস এবং অন্যান্য হাসপাতাল কর্ম্মীদের সাথে গতকাল বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমাদের দাবিগুলি প্রসঙ্গে উনি যে তথ্যগুলি সামনে রাখেন— ১) উনি ২০১৫ সাল থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে আছেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত একজন চিকিৎসক, একজন নার্স এবং একজন ফার্মাসিস্ট ও সাফাই কর্মী— এই শক্তি নিয়ে উনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালিয়ে আসছেন।

২) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিনি চিকিৎসক হিসেবে সোম থেকে বৃহস্পতিবার আউটডোর ডিউটি করেন এবং বৃহস্পতিবার রাতে পলাশীপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ডিউটি করেন।

৩) স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখা প্রয়োজন একথা স্বীকার করে উনি বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা খোলা থাকলে-তো শুধু হবে না, দরকার পরিষেবারও। কিন্তু অপর্যাপ্ত কর্ম্মী, নার্স এমন-কী ওষুধ নিয়ে চব্বিশ ঘন্টার পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। ওষুধ, ভ্যাকসিন ও অ্যান্টি ভেনাম অপর্যাপ্ত সরবরাহের তিনি সঠিকভাবে চিকিৎসা পর্য্যন্ত করতে পারেন না। যেমন, জ্বর, সর্দি, কাশি'র ক্ষেত্রে যেখানে পাঁচ দিনের ওষুধ দিতে হবে জেনে ও ওষুধ সরবরাহ না-থাকায় দুই দিনের দিতে বাধ্য হন। ফলত, আউটডোরে দেখাতে আসা রোগীদের ক্ষোভ ও হেনস্থার মুখে তাঁদের পড়তে হয়।

৪) অ্যান্টি র‍্যাবিস স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া হয় না। অ্যান্টি ভেনাম মাত্র একটি ফাইল থাকে। ফলত সাপে কামড়ানো রোগীদের ক্ষেত্রে ঐ একটি ফাইল দিয়ে কাজ চালাতে হয়, রোগীর সংখ্যা

বাড়লে তার কিছুই করার থাকবে না, রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া।

৫) আউটডোরে দেখাতে আসা রোগীদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেসক্রিপশন, কাগজের স্লিপ বর্তমানে ই-প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে দেওয়া হয়। ই-প্রেসক্রিপশনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে এটা মেনে নিয়ে উনি বলেন, সাধারণ কিছু ক্ষেত্রে (হাতে পায়ে ব্যথা) হয়ত কাগজের স্লিপ বা প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয় না। সব ক্ষেত্রেই প্রেসক্রিপশন দিতে হবে আমাদের এই দাবিতে তিনি সম্মত হ'ন।

৬) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্ত্তি পরিষেবার প্রসঙ্গেঃ ২০১৫ থেকে আজ পর্যন্ত রোগী ভর্ত্তির ব্যবস্থা নেই এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নন-বেডেড স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবেই কাজ করছে। কিন্তু তার আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্ত্তির ব্যবস্থা ছিল বলে তিনি ও শুনেছেন, দেখেননি। যদিও রোগী ভর্ত্তি করার বিষয়টি তার দায়িত্বাধীন নয়; যদি উর্ধ্বতন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই পরিষেবা চালু করে সেক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা করবেন। এই বিষয়ে তিনি বিএমওএইচ-এর সাথে কথা বলতে বলেন।

৭) অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা (যা আগে ছিল) চালু করার বিষয়েও তিনি বিওএমএইচ-এর কাছে দাবি জানাতে বলেন। আপাতত, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃযানের ব্যবস্থা স্বাস্থকেন্দ্রের পক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত দাবিগুলির পক্ষে নাকাশিপাড়া শাখার উদ্যোগে ২৬ মার্চ একটি পথসভা চলে। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি অনুধাবন করে সভায় এগিয়ে আসেন।

সাফল্যঃ

জানা গেছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সূত্রে, বর্ণিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখা এবং চুক্তি ভিত্তিক নার্স নিয়োগ করার প্রস্তুতি চলছে।

রিপোর্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কর্ম্মসূচী সমূহ

৬ আগষ্ট, ২০২৪, মৈপীঠ-কুলতলী শাখা বাঘে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে জামতলা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয়।

১৪ আগষ্ট, ২০২৪ সোনারপুর শাখা রাত দখল কর্ম্মসূচী পালন করে।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখা আর জি কর নিয়ে পথসভা করে।

৪ অক্টোবর, ২০২৪, জয়নগরের মহিষমারিতে নির্যাতিতা ও মৃতা বালিকার ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করা হয়।

৮ অক্টোবর, ২০২৪, নির্যাতিতা ও মৃত বালিকার ঘটনার নিরপেক্ষ, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও আসল দোষীদের শাস্তির দাবিতে বারুইপুর পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১১ অক্টোবর, ২০২৪, সোনারপুর তিলোত্তমা মোড়ে অনশন কর্ম্মসূচী পালন করে সোনারপুর শাখা যৌথ উদ্যোগে।

১৫ অক্টোবর, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখা অনশন অবস্থান করে।

১৮ অক্টোবর, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখা আকড়া ষ্টেশন সংলগ্ন বাস ষ্ট্যান্ডে পথসভা করে— আর জি কর, মহিষমারি ও NIA এবং STF নিয়ে।

প্রতি বছরের মত ডায়মন্ড হারবার ও জয়নগর শাখা শারদোৎসবে বুক ষ্টল দেয়।

১৭ নভেম্বর, ২০২৪, গড়িয়া শাখা ৪৫ বি বাসষ্ট্যান্ডে NIA, STF নিয়ে পথসভা করে।

নভেম্বরে সোনারপুর বইমেলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা (বজবজ) অংশগ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে চড়িয়াল খাল বুজিয়ে দেওয়া নিয়ে 3rd planet এর সাথে যৌথ উদ্যোগে মিছিল করা হয়।

৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, প্রতিবছরের মত এবছরও মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখা কালা দিবস পালন করে।

৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে চিতুরি বন দফতরে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়। বড়বাবু ঐ ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করে।

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, ডায়মন্ড হারবারে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে পথসভা হয়।

২০ ডিসেম্বর, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখার উদ্যোগে কালীতলা আশুতি থানায় FIR করা হয়। সুনন্দ হালদার নামে এক যুবক জিন্স কারখানার কারিগর, ঐ কারখানায় জলের বোতলে রাখা অ্যাসিড, জল ভেবে খেয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষ কোনও দায় নিতে চায় না। উপযুক্ত চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ও FIR করা হয়।

২৩ জানুয়ারি '২৫, দক্ষিণ ২৪ জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ডায়মন্ড হারবার শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্তোষপুর দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টারের দাবিতে শিয়ালদহ DRM অফিসে ডেপুটেশন দেয় মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখা। তার আগে প্রচার কর্ম্মসূচী ও সই সংগ্রহ অভিযান করা হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন দাবি ও চলমান ঘটনাবলী নিয়ে বিভিন্ন শাখা লাগাতার পোষ্টার লাগানো চলছে।

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন ঃ

১১-১২-২০২৪ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা কমিটির অবস্থান, উপস্থিতি ৪৭ জন।

১৪-১২-২০২৪ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুঁচুড়া শাখার ২টি পথসভা (চকবাজার, ব্যান্ডেল চার্চ)

১৪-১২-২০২৪ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে শ্রীরামপুর শাখার সাংস্কৃতিক উদযাপন (স্নানপিঁড়ি মাঠ, মাহেশ)

৩০-১২-২০২৫ চন্দননগর স্টেশনে ভাবাদীঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের প্রচারপত্র বিতরণ

০৫-০১-২০২৫ চুঁচুড়ায় ভাবাদীঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের গণ কনভেনশনে অংশগ্রহণ (উপস্থিতি- ৮০ জন)

১৭-০১-২০২৫ কলকাতা বইমেলায় এপিডিআরকে স্টল না দেবার প্রতিবাদে চন্দননগরে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ (লক্ষ্মীগঞ্জ রথতলা)

১৮-০১-২০২৫ কলকাতা বইমেলায় এপিডিআর-কে স্টল না-দেবার প্রতিবাদে চন্দননগর স্টেশনে বিশিষ্ট নাগরিকদের লিফলেট বিতরণ

২৫-০১-২০২৫ 'ভ্রমণ আড্ডা'র বন্ধুদের নিয়ে ভাবাদীঘি গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা।

কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১২ এপ্রিল ২০২৫

১০-১২-২৪, ছিয়াত্তরতম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কলেজ স্ট্রিট, মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল-এর সামনে অবস্থান ও পথসভা হয়ছে। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি, দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রতিবাদী সঙ্গীত ও আবৃত্তি এই দিনের অনুষ্ঠানকে অন্য এক মাত্রয় পৌছে দেয়।

(২ থেকে ৪) জানুয়ারী, ২০২৫, কলেজ স্কোয়ারে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় অধিকারের ষ্টল দেওয়া হয়। যোগ দেয় সংগঠনের সদস্যরা।

৮-১-২০২৫, এপিডিআর-কে কোলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ষ্টল দিতে টালবাহানা করা ও অদ্ভূত কারণ দেখিয়ে আমাদের অংশগ্রহণ করতে দিতে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে বুক সেলার এন্ড পাবলিশার্স গিল্ডের অফিসে মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়। বহু ছোট লিটিল ম্যাগাজিন সংস্থার প্রতিনিধিরা এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১০-১-২০২৫ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে গিল্ডের তুঘলকি আচরণ ও বইমেলাকে ব্যবসায় পরিণত করার বিরুদ্ধে, এপিডিআর-কে বুকষ্টল দেওয়ার দাবিতে পথসভার আয়োজন করা হয়।

২০-১-২০২৫ কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির সামনে প্রতিবাদী সভা করা হয়। বাংলাদেশের অস্থিরতাকে সামনে রেখে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, বইমেলার অন্য বুকষ্টলে বাংলাদেশের প্রকাশনার বই না-রাখার ফতোয়ার বিরুদ্ধে এবং এপিডিআরকে বুকষ্টল না-দেওয়ায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদী পথসভা হয়। এই পথসভায় মুর্শিদাবাদ থেকে বেশকিছু সদস্য যোগ দেন।

২২-১-২০২৫, গিল্ডকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো, বইমেলার গণতান্ত্রিক পরিসর ধ্বংস করার বিরুদ্ধে ও বাংলার আবেগ ও সংস্কৃতি রক্ষার শপথ নিতে ও এপিডিআরকে ষ্টল না দেওয়ায় বিরুদ্ধে কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে লিটল ম্যাগাজিন, ছোট প্রকাশনা সংস্থা ও বেশ কিছু গণসংগঠন নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটি হ'লে কনভেনশন এর আয়োজন করা হয়। এপিডিআর এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে ও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

২৮-১-২০২৫, কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন বিভিন্ন গণসংগঠন, ছোট প্রকাশনা ও লিটল ম্যাগাজিন এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল প্রতিবাদী স্লোগান ও এপিডিআর-কে বুকষ্টল না-দেওয়াকে ধিক্কার জানিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রতিবাদী স্লোগানে ও বহু মানুষের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত

হয়ে ওঠে এই মিছিল।

২-২-২০২৫, কলকাতা বইমেলা চত্বরে গিল্ডের তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্ম্মসূচী পালন করে সংগঠনের সদস্যরা। অন্যান্য বহু লিটল ম্যাগাজিন, ছোট প্রকাশনা সংস্থা ছাড়াও নানা গণসংগঠন সমর্থন করে এই বিক্ষোভ কর্ম্মসূচীকে।

১৩-২-২০২৫, ছত্তিশগড়ে মাওবাদী তকমা দিয়ে সাধারণ গ্রামবাসী ও আদিবাসী হত্যা বন্ধের দাবিতে, জল জমি জঙ্গল কেড়ে দেশি বিদেশি কর্পোরেটকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদী নিকেষ করার নীল নকশা অপারেশন 'কাগার' বন্ধ করার দাবিতে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা অবধি মিছিলে এপডিআর-ও অংশগ্রহণ করে অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে। স্বতঃস্ফূর্ত এই মিছিল সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

২৫-২-২০২৫, আদিবাসী হত্যা বন্ধের দাবিতে, জল জমি জঙ্গল কেড়ে দেশি বিদেশি কর্পোরেটকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদী নিকেষ করার নীল নকশা অপারেশন কাগার বন্ধ করার দাবিতে, ২১ হাজার গ্রামবাসী ও বহু গ্রাম উচ্ছেদ করে দেউচা-পাচামী খোলামুখ কয়লাখনি প্রকল্প বন্ধ করার দাবিতে হাজরা মোড়ে পথসভা করা হয়।

২৮-২-২০২৫, বার্ষিক কপিল ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। ফ্যাসিবাদের ১০০ বছর বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করে শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

১৫-৩-২০২৫, যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলন ও সেই আন্দোলন প্রতিবাদী ছাত্রকে গাড়ী চাপা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

২১-৩-২০২৫ ভারত সভা হলে দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী স্মারক আলোচনা চক্রে অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ বিষয়ে তরুণ সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী বক্তব্য রাখেন। মুনাফা ও লুটপাটের ত্রিভুজ— আদানি-মোদি-হাসিনা শীর্ষক আলোচনায় ব্যাখা করেন অপর তরুণ সাংবাদিক অর্ক দেব। উভয়ের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিচারে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

৬-৪-২০২৫ উত্তর ২৪ পরগণা'র পানিহাটি-সোদপুর শাখার সুব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ঐ দিন সভা শুরুর আগে সকাল সাড়ে ন'টায় আগত প্রতিনিধি এবং এপিডিআর-এর শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে সংগঠিত একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে কর্ম্মসূচী'র সূচনা হয়। অধিকার আন্দোলনের এবং গণ আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ হয়।

১৩ তম এই বার্ষিক সভায় এপিডিআর পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি শাখার ২২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্যের জেলা, শাখা ও সদস্যের উপস্থিতিতে সভা সার্থক রূপ পায়। আগামীদিনে সংগঠন এর কর্ম্মধারা নিয়ে মতামত দেন বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা।

১৩ তম বর্ষিক সভা আয়োজনের দায়িত্ব নেয় পানিহাটি-সোদপুর শাখা। বার্ষিক সভাকে সামনে রেখে পানিহাটি-সোদপুর শাখা, অঞ্চলে চারটি পথসভা করেছে। একটি রাজ্যস্তরের সভা করতে যে-যে প্রক্রিয়াগুলি করা দরকার তার সবকটিই পানিহাটি-সোদপুর শাখা কৃতিত্ত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে।

১১-৪-২০২৫ কলকাতায় শিক্ষক আন্দোলনে ও মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলন সহ সারা রাজ্য জুড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হাজরা মোড়ে প্রতিবাদী পথ সভায় সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যরা।

....

২ পাতার পর

সোদপুর অমরাবতী খেলার মাঠকে বাঁচাতে...

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেন। ওই প্রতিষ্ঠান উক্ত খেলার মাঠে ১৪০০ কাঠার ওপর হাউসিং কমপ্লেক্স নির্ম্মাণ করবে। কিন্তু ওই প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তখন থেকেই এপিডিআর পানিহাটি শাখা এই মাঠ, জলাশয় ও জলাভূমি রক্ষা করার জন্য পানিহাটিতে আন্দোলন সংগঠিত করে। পৌরসভার বিভিন্ন নথি থেকে আমরা জানতে পারি পানিহাটি পৌরসভা SPCI ও Secretary কে ০৬-০১-১৯৮৪ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠায় যে The West Bengal Town and Country (planning 2 Development Act) ১৯৭৯ অনুসারে SPCI এর মালিকানাস্থিত ওই ২৫৪ (ola) নং হোল্ডিং-এর ওই ৮৫ বিঘা জমি সোদপুর অঞ্চলের Housing Park, Playground এবং Community Hall নির্ম্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে ২০.০৮.৮৬ তারিখে জনগণকে ওই জমি কোনও প্রকার হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয় ও দান করা থেকে বিরত থাকতে বলে এবং Sports Complex এর নির্ধারিত জমি হিসেবে চিহ্নিত করে একটি Public Notice-ও জারি করে। ০১.০১.২০০০ সালে ওই Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুসারে

তদানিন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই মাঠে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫ বিঘা জমির উপর একটি Sports Complex নির্ম্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মর্মে সেখানে একটি সাইনবোর্ডও টাঙ্গানো হয়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান মনোরঞ্জন সরকারও আশ্বাস দেন সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ মঞ্জুর করলেই এই প্রকল্প শুরু হবে। কিন্তু তারপরে এই প্রকল্প রূপায়ণ করার উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি।

ইতিমধ্যে গত প্রায় এক দশক ধরে পানিহাটি পৌরসভা দৈনন্দিন বর্জ্য সংগ্রহ করে অমরাবতী খেলার মাঠের একটা বড় অংশ ফেলে সেখানে একটি ভাগাড়ের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় পরিবেশ এক ভয়ানক দূষণ এবং দুঃসহ দুর্গন্ধে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি গত ডিসেম্বরে পানিহাটি পৌর অঞ্চলে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে একটি খবর মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে যে অমরাবতী খেলার মাঠ কোনও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। যদিও APDR-পানিহাটি শাখা এই খবরের সত্যতা যাচাই না-করেই গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০২৪, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সহকারি মৎস্য অধিকর্তা বারাসাত পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য দপ্তরে পানিহাটি শাখার পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানিহাটি পৌরসভাকে সরেজমিনে তদন্ত করে বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেয়। পৌরসভার পক্ষ থেকে SPCI এর সঙ্গে গত ০৩.০১.২৫ এ মিটিং করা হয় এবং পৌরসভা জেলাশাসককে ০৭.০১.২৫ তারিখে SPCI এর উত্তর পাঠায়। DM Office থেকে সেই উত্তর APDR-পানিহাটি শাখাকে পাঠানো হয়। SPCI এর ০৭.০১.২৫ এর পৌরসভাকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি—

১) SPCI (estd. ১৮৯৮) ০৭.০৯.১৯৩৯ সালে জনৈক ব্রজকিশোর দত্তের থেকে ৩৯০০০ টাকার বিনিময়ে এই জমি ক্রয় করেছেন।

২) তদানীন্তন রাজ্য সরকার ০৬.০১.১৯৮৪ সালে যে notice দিয়ে ওই জমি Sports Complex করার জন্য অধিগ্রহণ (Vest) করতে চায় তার বিরুদ্ধে তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কলকাতা উচ্চ আদালত সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেয়।

৩) SPCI-এর ওই মাঠ যেহেতু বলপূর্বক এবং বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক কার্য্যকলাপ চলছে, বাস স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পৌরসভার ডাম্পিং রাউন্ডে পরিণত করা হচ্ছে। এই কারণে তারা ওই জমি সুরক্ষিত রাখবার জন্য সীমানা নির্ণয় প্রক্রিয়া চলছে।

৪) যদি ওই জমিতে সোসাইটির উন্নতির জন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষেই তা' করা হবে।

আমরা SPCI এর পাঠানো কলকাতা হাইকোর্টের ১২.১০.২০০১ এর রায় থেকে দেখছি যে যেহেতু SPCI একটি মানবপ্রেমী সংগঠন এবং অলাভজনক এবং অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাই তাদের ক্ষেত্রে The Urban Land Celing Act ১৯৭৬ প্রযোজ্য নয় তাই পৌরসভার জমি অধিগ্রহণ এর বিজ্ঞপ্তি আদালত খারিজ করে দেয় এই শর্ত আরোপ করে। ‘কিন্তু যদি দেখা যায় সোসাইটির কোনও জমি ব্যবসায়িক বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই জমি অধিগ্রহণের জন্য পুনরায় বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে।' (কেস নং CO ১৮৯৮৪ (w)/৯৩ মাননীয় বিচারপতি দিলীপ কুমার শেঠ)

মহামান্য আদালতের এই রায়কে সামনে রেখেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) প্রশাসনের কাছে দাবি করছে এই জমির কোনও অংশ যদি লাভজনক বা ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাঁরা যেন আদালতের রায় মেনে The ULC Act 1976 (Sec19) অনুসারে জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি পাঠায় এবং খেলার মাঠের ভিতর জলাশয় ও জলাভূমি যেন কোনোভাবেই The West Bengal Inland Fisheries Act 1984 (Sec17A) অনুসারে বোঝানো না হয় তা নিশ্চিত করে।

পরিবেশ, প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে কোনভাবেই যেন জলাশয় ও জলাভূমি বোজানো না হয়।

APDR মনে করে পূর্বতন সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অমরাবতী খেলার মাঠে একটি Sports Complex গড়া হোক এবং সত্বর এই মাঠে পৌরসভার জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হোক।

দৃশ্যত, অমরাবতী খেলার মাঠের জলাশয় ও জলাভূমি থেকে জল সেচ করে ভরাট করে জমির চরিত্র পরিবর্তন করা হচ্ছে যা আইনত দণ্ডনীয়।

গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মানবাধিকার সংগঠন APDR এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর অমরাবতী খেলার মাঠ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিয়ে মাঠ বাঁচানোর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁকে e-mail করেছেন।